পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮২ সালের নব-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী
অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।

Board's Circular No. Syll/84/3/SL.No./75, dated 29.11.84

ইতিহাস পরিচয়

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

১৯৮২ সালের পরিমার্জিত সিলেবাস অনুসরণে লিখিত।

ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ এম. এ, পি. এইচ. ডি.
অধ্যাপক, (ইতিহাস বিভাগ), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কোচবিহার।

ও

পরিমল সেন এম. এ, বি এড, ডি. ই. এল. টি.,
শিক্ষক, মেহেরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যাপক,
আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজ, জলপাইগুড়ি

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরকুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর—১৯৮১
দ্বিতীয় পরিমার্জিত প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮২
তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৩
চতুর্থ সংস্করন, জানুয়ারী ১৯৮৫

মূল্য : ১৪ টাকা

মুদ্রাকর
প্রিন্ট-ও-গ্রাফ
৯-সি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

অধ্যায়

এক

আধুনিক যুগ

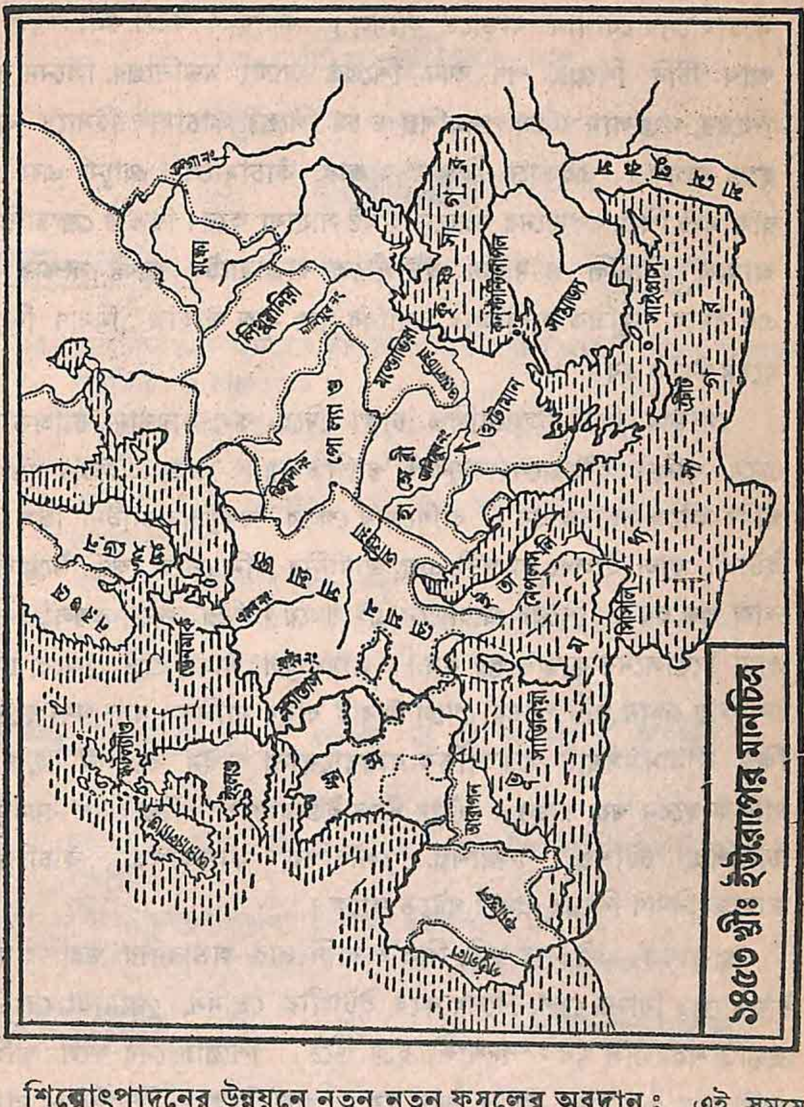
ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীগণ কর্তৃক কন্স্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর থেকেই মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের যুগ পরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট সন বা তারিখ থেকে শুরু হতে পারে না। ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই ঘটে যুগ পরিবর্তন। মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগে উত্তরণ কালেও এমনিভাবে ইউরোপে নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। তার মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিঃ মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। এই সময়ে প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। জমিদারের ভূমি চাষ করেই ম্যানরবাসীদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির কিছু পরিবর্তন ঘটল। এতকাল কৃষি ও কুটিরশিল্প গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই পাশাপাশি চলত। এইবার কুটির শিল্পগুলি কৃষি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অসংখ্য শহর গড়ে উঠে। ফলে কুটিরশিল্পগুলি শহরে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। ইউরোপের বাণিজ্যিক শহরগুলি বণিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন গিল্ড ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। শিল্প-বাণিজ্যে এতকাল চড়াসুদে অর্থ লগ্নী করত ইহুদীরা এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্যাহোরবাসীরা। এইবার এদের স্থান দখল করল ব্যাঙ্ক

ব্যবসায়ীরা। এই কাজে লম্বার্ডদের সুনাম ছিল বেশী। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিভিন্ন গিল্ড বা লীগের (যেমন—হেনেস্টিক লীগ, রেনীশ লীগ ইত্যাদি) চরম উন্নতি ঘটে। এইসব লীগ বণিকগোষ্ঠীর সংগঠন শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শহরগুলিকে রক্ষা করে। তাদের মাধ্যমে ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটে।

সামন্ত প্রথার অবক্ষয়ঃ সামন্ত ব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বংশ পরম্পরায় ম্যানরবাসী ভূমিদাসেরা সামন্ত প্রভুদের বেগার খেটে এসেছে। তাদের জীবনে আনন্দ কিংবা স্বচ্ছলতা বলে কোন জিনিস ছিল না। ম্যানর-জীবন তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল যেন বন্দীজীবন। মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থায় আর আস্থা রাখতে পারল না। একদিন এই একঘেয়ে ও অন্ধকারময় জীবনের অবসান ঘটল। অনেকদিন ধরেই নানা কারণে সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। অতঃপর সারা ইউরোপ জুড়ে যখন ক্রুশেড অভিযান আরম্ভ হয়, তখন ম্যানরবাসী ভূমিদাসেরা এই সূত্রে শহরে পালিয়ে গিয়ে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি পেল। ধীরে ধীরে সামন্ত তন্ত্রেরও অবসান ঘটল।

কৃষি উৎপাদন প্রণালীর উন্নয়নঃ এই সময়ে ইউরোপে অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে। পুরানো এবং নতুন শহরগুলির লোকসংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। তখন অধিক লোকের খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য অধিক ফসলের প্রয়োজন হলো। এর ফলেই কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়। আগে বছরে যেখানে দু'বার চাষ হত, এখন সেখানে বছরে তিনবার চাষ হতে লাগল। শক্তিশালী বলদ কিংবা ঘোড়ার সাহায্যে লোহার লাঙ্গল দিয়ে ভূমিকর্ষণ আগের চেয়ে অনেক উন্নত হলো। কৃষিকার্যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে থাকে। জঙ্গল ও জলাভূমি সংস্কার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলো। এর ফলে ফসলের পরিমাণ দারুণভাবে বেড়ে যায়। তাছাড়া পশুখাদ্যের জন্য একপ্রকার ঘাসের চাষও শুরু হয়েছিল।



১৪৫৩ খ্রীঃ ইউরোপের মানচিত্র

শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে নতুন নতুন ফসলের অবদান : এই সময়ে প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং এই সূত্রেই ইউরোপ সেই সব দেশের নতুন নতুন কৃষিপণ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। ক্রমে ইউরোপেও ধান, আখ, আলু, ভুট্টা, তামাক, পীচ, লেবু, শণ প্রভৃতি নতুন নতুন ফসলের চাষ হতে থাকে। এইসব নতুন ফসল শিল্পের

কাঁচামালের যোগান বাড়াতে লাগল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আখ চিনি শিল্পের, শণ বয়ন শিল্পের, দ্রাক্ষা মদ্যশিল্পের, লিনেন কাগজ শিল্পের, পশুলোম ও চর্ম পশমশিল্প ও চর্ম শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। এইভাবে বিস্তৃত বাজার, কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং উন্নত রাস্তাঘাট শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আমলে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট সংস্কার হয়। এই সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

গোড়ার দিকে জলচালিত চাকা দিয়ে কল-কারখানা চালিত হত। ক্রমে পশ্চিম ইউরোপে বায়ুকল স্থাপিত হয়। তাছাড়া উন্নত যন্ত্রপাতি খনির কাজে সহায়ক হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রার চাহিদা ছিল বলে ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী এবং জার্মানির খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। শিল্পের প্রয়োজনে এই সময়ে বিভিন্ন দেশে কয়লা, লোহা, তামা উত্তোলনের কাজও শুরু হয়। সামন্তযুগে সামন্ত প্রভু কিংবা চার্চের এলাকায় কোন খনি পাওয়া গেলে তাঁরাই খনির মালিক বলে গণ্য হতেন। কিন্তু জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা আইন করলেন যে, খনির মালিক হবেন স্বয়ং রাজা। ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বয়নশিল্প, চিনিশিল্প, চটশিল্প, পশমশিল্প, লৌহশিল্প, কাগজশিল্প, কাঁচশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে।

প্রভাব : এইভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতির ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি শহরগুলি খুব সম্পদশালী হয়ে উঠে। শিল্পোন্নয়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণী নামে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অন্য দিকে পুঁজিবাদীদের দাপট দেখা দেবার ফলে ইউরোপের সভ্যতার চেহারা একেবারেই পাল্টে গেল। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পশ্চাতে রেখে এই যুগের মানুষ নবীন আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কালগতী

আধুনিক যুগের সূচনা—১৪৫৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

১। আধুনিক যুগের সূচনাতে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল আলোচনা কর।
২। শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে নতুন নতুন ফসলের অবদান বর্ণনা কর।
৩। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে কিভাবে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল ?
৪। আধুনিক যুগের সূচনাতে ইউরোপের কৃষিকার্যে কিরূপ নতুন পদ্ধতির প্রচলন হয় ?
৫। এই সময়ে ইউরোপের শিল্পে কিরূপ উন্নতি ঘটে ?
৬। ইউরোপের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ হত কোথা থেকে ?
৭। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে কি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩নম্বর**

১। কত খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক যুগের সূচনা হয় ?
২। ইউরোপে কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভূমিদাসরা শহরের দিকে ধাবিত হয়েছিল ?
৩। ইউরোপে নতুন প্রচলিত হয় এমন দুটি ফসলের নাম কর।
৪। ইউরোপের কোন্ রাজা এই সময়ে রাস্তাঘাটের সংস্কার করেছিলেন ?

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১। সঠিক উত্তরটির পাশে √ চিহ্ন দাও :
(ক) ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগ শুরু হয় রোম সাম্রাজ্যের কন্‌স্ট্যান্টি-নোপলের পতনের পরে।
(খ) এই সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার/ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে।
(গ) ক্যাহোরে/ভেনিসে একটি শক্তিশালী অর্থলগ্নীকারী দল গঠিত হয়েছিল।
(ঘ) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সময়ে স্বর্ণমুদ্রার কাগজী মুদ্রার চাহিদা ছিল বেশী।

অধ্যায়

দুই

ইউরোপের নবজাগরণ

নব জাগরণের অর্থ ঃ ফরাসী শব্দ 'রেনেসাঁস কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'নব জাগরণ'। মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই প্রাচীন ধারার অনুশীলনকেই নব জাগরণ বলা হয়।

(ক) **নব জাগরণের স্বরূপ ঃ** প্রচলিত মত অনুযায়ী কন্স্ট্যান্টি-নোপলের পতনকাল থেকেই নব জাগরণের অভ্যুদয়কাল গণনা করা হয়। নব জাগরণকে সাধারণতঃ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন কখনও হঠাৎ আসে না। বস্তুতঃ মধ্যযুগের শেষভাগেই ইউরোপীয়দের জীবনে এই পরিবর্তনের আভাষ পরিলক্ষিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষের জ্ঞানলাভের আগ্রহ তখন বৃদ্ধি পেয়েছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবরা প্রচার করে। **অ্যারিস্টটলের** ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করে মধ্যযুগের পণ্ডিতরা অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা অজানা জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, আর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। এইভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনই নব জাগরণের পথ প্রশস্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, কন্স্ট্যান্টিনোপল তুর্কীজাতির অধীনে আসার ফলে বহু গ্রীক পণ্ডিত প্রাণ ও ধর্মের ভয়ে কন্স্ট্যান্টিনোপল ছেড়ে তাঁদের মূল্যবান পুঁথি-পুস্তক নিয়ে ইটালীর বিভিন্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের

আগমনে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থগুলির সঙ্গে ইউরোপবাসীদের পরিচয় ঘটে। এর ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগরণের প্রসার ঘটে। গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থগুলির উপর ইউরোপবাসীদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বেশ বেড়ে যায়।

তৃতীয়তঃ, মধ্যযুগের যাজকগণ সংসার ত্যাগ করতে এবং উপবাস ও তপস্যার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু প্রাচীন রোমান ও গ্রীকদের জীবনধারা ছিল এর বিপরীত। তাদের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনার ফলে নতুন করে মানুষ বুঝতে পারে জগৎ আনন্দময়। বেঁচে থেকে দেহ ও মনের উন্নতি সাধনই জীবনের উদ্দেশ্য।

চতুর্থতঃ, মধ্যযুগের এইসব যাজক সাধারণ লোকদের অন্ধভাবে চার্চকে মান্য করতে শেখাতেন। তাঁরা বলতেন, জগতে যা কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে সবই ঈশ্বরের ইঙ্গিতে হচ্ছে। চার্চের এইসব মতবাদ সকলকে বিশ্বাস করতে হত, নইলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত। এইভাবে ধর্মের প্রচণ্ড শাসনে ও চিরাচরিত প্রথার চাপে মানুষ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নির্বিবাদে পিতৃ পিতামহদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন-যাপন করত। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মানুষ নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরাতন বিশ্বাসকে আর মানতে চাইল না। অজানাকে জানবার আগ্রহ, অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে সবকিছু যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছা এবং সুন্দর জীবন যাপনের বাসনা এই নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট।

(খ) **ইটালীর নেতৃত্বদান :** নবজাগরণ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে ইটালীতে। মধ্যযুগের শেষভাগে ইটালীতে ফ্লোরেন্স, মিলান, রোম, ভেনিস, পিসা, জেনোয়া প্রভৃতি অনেকগুলি নগর-রাষ্ট্র ছিল এই নগর-রাষ্ট্রগুলি শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল। ক্রুশেডের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য করে এখানকার অধিবাসীরা খুব ধনশালী হন। এইসব নগর-রাষ্ট্রের ধনী বনিক ও রাজপুত্ররা সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রাসাদ ও শিল্পকার্য পছন্দ করতেন।

শিল্পকার্যের জন্য তাঁরা শিল্পীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতেন।

কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর যে সব গ্রীক পণ্ডিত ইউরোপে আসেন তাঁরাও ইটালীর এই শহরগুলিতে প্রচুর সমাদর পান। এইসব শিল্পী ও ও পণ্ডিতদের আবির্ভাবে ইটালীর শহরগুলি সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। ইটালীতে প্রথমে ফ্লোরেন্সে এবং পরে সেখান থেকে মিলান, রোম প্রভৃতি শহরে নবজাগরণের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রমে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঢেউ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপকে প্লাবিত করে দেয়। জার্মানি, ফ্লাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এর ঢেউ এসে লাগল।

চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ : প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ এই যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট। মানব-জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে এই সময়ে যেসব আলোচনা বা চর্চা হত তাকে বলা হত 'মানবতাবাদ' এবং যাঁরা এইসব আলোচনা করতেন তাঁদের বলা হত 'মানবতাবাদী'। নবজাগরণ যুগের মানবতাবাদীরা উন্নত শ্রেণীর বহু সাহিত্য, নাটক, কাব্য, দর্শন ও সঙ্গীত রচনা করে মানুষেরই জয়গান করেছেন।



দান্তে

দান্তে : মানবতাবাদীদের মধ্যে প্রথমেই ইটালীর মহাকবি দান্তের কথা উল্লেখ করতে হয়। দান্তের রচনাতেই ইউরোপের নবজাগরণের আভাষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি ইটালীয় ভাষায় **'ডিভাইন কমেডি'** নামক বিখ্যাত কাব্যখানি লিখে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। এই মহাকাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। শান্তি

ও অনুতাপের ভিতর দিয়ে মানুষের আত্মা ভগবানের কাছে কেমন করে পৌঁছায়, দান্তে সেই কাহিনী আশ্চর্য কল্পনায় চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যখানি বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্যসম্পদ।

ইটালীর আরও একজন প্রথম সারির মানবতাবাদী ছিলেন পেত্রার্ক।

পেত্রার্ক

ফ্লোরেন্সের এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। পেত্রার্ক ইটালীতে নবজাগরণের বার্তা বহন করে এনেছিলেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের বহু মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন পুঁথি-পত্র নকল করে সংগ্রহ করেছিলেন এবং গভীর যত্নের সঙ্গে পাঠ করে তিনি এইসব গ্রন্থের ভাব ও সৌন্দর্য দেশবাসীর কাছে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইটালী ভাষায় কতকগুলি সনেট কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।



পেত্রার্ক

এই সময়ে ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনায় নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তন করেন মেকিয়াভেলি। তাঁকে বলা হয় 'ইউরোপের কৌটিল্য'। তিনি তাঁর রাজনীতির মতবাদ **'দি প্রিন্স'** নামক গ্রন্থে লিখে গেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

মেকিয়াভেলি

দেশের স্বার্থের জন্য রাজাকে ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌দের পথ-প্রদর্শক।



মেকিয়াভেলি

বোকাচ্চিও ছিলেন ইটালীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন পেত্রার্কের বন্ধু। পেত্রার্কের পরামর্শে তিনি গ্রীকভাষা শিক্ষা করে ইটালীতে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত **'ডেকামেরণ'** একটি বিখ্যাত ইটালীয় গল্পগুচ্ছ। তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন।



বোকাচ্চিও

এই যুগের ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন **ফ্রান্সিস বেকন**। তাঁকে ইংরাজী দর্শনের আদি গুরু বলা হয়। ইংরাজী প্রবন্ধ সাহিত্যেও তিনি এক নতুন রূপ প্রবর্তন করেছিলেন।



ফ্রান্সিস বেকন

নবজাগরণ যুগের সূচনাতে ইটালীর লেখক বোকাচ্চিও-র গল্প পড়ে ইংরাজ কবি **চসার** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'ক্যাণ্টারবেরী টেলস'** রচনা করেন। সে যুগে অনেক



চসার

লোক ক্যান্টারবেরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যেত। চসারের কাব্যে কয়েকজন যাত্রী এইভাবে গল্প করতে করতে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কবি নিজে আছেন। অন্য সঙ্গীদের মধ্যে একজন বণিক, একজন চিকিৎসক, একজন আইন ব্যবসায়ী, একজন ফ্রায়ার, একজন সন্ন্যাসিনী। আরও আছেন 'বাথ' অঞ্চলের এক গৃহিণী। গল্পগুলি বড় সুন্দর ও মজার।

চসার

চসারের পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা কবি হলেন **এডমণ্ড স্পেন্সার**। তিনি **'ফেয়ারী কুইন'** নামে একখানি কবিতার বই লিখে গেছেন। বইটি চার খণ্ডে বিভক্ত।

স্পেন্সার



স্পেন্সার



শেক্সপীয়ার

ইংলণ্ডে এই নবজাগরণ কাব্যে, সাহিত্যে ও অপরূপ সঙ্গীতে পুষ্পিত হলো রানী **এলিজাবেথের** যুগে। এই সময়েই ইংলণ্ডে সৃষ্টি হয় **শেক্সপীয়ারের** মহান সাহিত্য। তাঁর রচিত **'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'কিং লিয়ার', 'মার্চেণ্ট অফ ভেনিস'** প্রভৃতি নাটকগুলি আজও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

শেক্সপীয়ার

নবজাগরণের যুগে নেদারল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক ছিলেন **ইরাসমাস**।



ইরাসমাস

লেখার তীক্ষ্ণতায় সে যুগে তাঁর জুড়ি খুব কমই ছিল। তাঁর চেষ্টাতেই নেদারল্যাণ্ডে নবজাগরণের ভাবধারা প্রচারিত হয়।

এই সময়ে স্পেনের বিখ্যাত কবি ছিলেন **সারভাণ্টিস**, তিনি **'ডন কুইকজোট'** নামক এক খানি বই লিখে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁকে আধুনিক উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক বলা হয়। তিনি ছিলেন শ্রেণীহীন সমাজের পক্ষপাতী।

ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত লেখকের নাম ছিল **রাবেলে**। তিনি ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তি। তাঁর প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম 'গ্যারগানচুয়া'। তাঁর লেখা পড়ে লোকেরা বেশ মজা পেত।

রাবেলে



মোনালিসা

শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ : নবজাগরণের ভাবধারা সাহিত্যের ন্যায় চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। এই যুগের শিল্পীরা ছিলেন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শিল্প-সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তাঁদের শিল্পকার্যে ও সৌন্দর্যের প্রতি এই অনুরাগ নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। শিল্পীদের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

মোনালিসা

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ছিলেন ইটালীর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর অভিজাত 'মোনালিসা', 'শেষ ভোজন' (লাষ্ট সাপার) প্রভৃতি চিত্র আজও অমর হয়ে আছে।

ম্যাডোনা

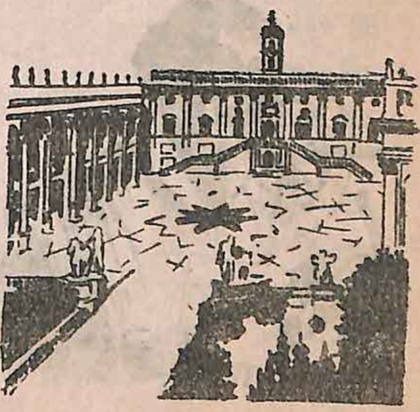
'ম্যাডোনা' চিত্রাঙ্কণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন র‍্যাফায়েল। তিনি মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। এই অল্প-পরিসর জীবনে তিনি অসংখ্য সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। পোপের প্রাসাদের কতকগুলি প্রাচীর চিত্র ও ম্যাডোনার কয়েকখানি সুন্দর ছবি তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। মাতা মেরীর কোলে যীশুর চিত্রগুলি চিত্র জগতের অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত।



ম্যাডোনা



মোজেস



সেণ্টপীটার্স গীর্জা

নবজাগরণের যুগে ইটালীর আর একজন প্রতিভাধর শিল্পী হলেন

মাইকেল এঞ্জেলো। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে তিনি প্রায় সমান পারদর্শী ছিলেন। পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ করতে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী কমই ছিল। তাঁর মোজেস মূর্তি জগদ্বিখ্যাত। সেন্টপীটার্স গীর্জার উপরের গম্বুজটি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন।

মোজেস
সেন্টপীটার্স গীর্জা

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণঃ মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চাকে যাজক সম্প্রদায় মোটেই সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু নবজাগরণের যুগে সাহিত্য ও শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনাও পুরাতন ধারাকে ছাড়িয়ে এক নতুন স্তরে এসে পৌঁছেছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক ছিলেন ইংলণ্ডের **রোজার বেকন**। তিনি প্রায় সাতশ' বছর পূর্বে লিখে গেছেন যে, যানবাহন নিজে নিজেই চলবে এবং পক্ষযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আকাশে পাখীর মত উড়তে পারবে। বাষ্পীয় শক্তি সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব নবজাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

রোজার বেকন

ফ্রান্সিস বেকন ও লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির কথা আমরা ইতিপূর্বে যথাক্রমে সাহিত্যিক ও শিল্পী হিসাবে পরিচয় পেয়েছি। তাঁরা দু'জনে আবার বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন, আর দা-ভিঞ্চি পূর্তবিদ্যা ও নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।



কোপার নিকাস

এই যুগের বৈজ্ঞানিকরা নতুন নতুন তথ্যও আবিষ্কার করেন। পোল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক **কোপার**

নিকাস আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। **কিন্তু চার্চের** হাতে শাস্তির ভয়ে তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন নি। অবশেষে তাঁর মৃত্যুর পর ইটালীর বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এর সাহায্যেই তিনি কোপারনিকাসের মতবাদ সত্য বলে প্রমাণ করেন।

কোপারনিকাস, গ্যালিলিও

নবজাগরণের এই জয়যাত্রা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতসব কর্ম-কাণ্ডের পিছনে ছিল মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন জার্মানির **গুটেনবার্গ**। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বহু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। নবজাগরণের যুগে শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার না হলে তা এত ফলপ্রসূ হতে পারত না।

মুদ্রাযন্ত্র

কালপঞ্জী

রোজার বেকন	১২১৪—১২৯৪ খ্রীঃ
দান্তে	১২৬৫—১৩২১ খ্রীঃ
পেত্রার্ক	১৩০৪—১৩৭৪ খ্রীঃ
বোকাচ্চিও	১৩১৩—১৩৭৫ খ্রীঃ
চসার	১৩৪০—১৪০০ খ্রীঃ
লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি	১৪৫২—১৫১৯ খ্রীঃ
গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র	১৪৫৪ খ্রীঃ
ইরাসমাস	১৪৬৬—১৫৩৭ খ্রীঃ
মেকিয়াভেলি	১৪৬৯—১৫২৭ খ্রীঃ
কোপারনিকাস	১৪৭৩—১৫৪৩ খ্রীঃ
মাইকেল এঞ্জেলো	১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রীঃ
রাফায়েল	১৪৮৩—১৫২০ খ্রীঃ
রাবেলে	১৪৯৪—১৫৫৩ খ্রীঃ
এডমণ্ড স্পেন্সার	১৫৫২—১৫৯৯ খ্রীঃ
ফ্রান্সিস বেকন	১৫৬১—১৬২৬ খ্রীঃ
উইলিয়ম শেক্স্পীয়ার	১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীঃ
গ্যালিলিও	১৫৬৪—১৬৪২ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৯নম্বর**

১। নবজাগরণের স্বরূপ বর্ণনা কর।

২। মানবতাবাদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৩। নবজাগরণের যুগে শিল্পের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল তা লেখ।

৪। নবজাগরণের যুগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার একটি বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৩নম্বর**

১। 'নবজাগরণ' বলতে কি বোঝ?

২। ইটালীতে নবজাগরণ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন?

৩। 'মানবতাবাদ' বলতে কি বোঝ? কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম উল্লেখ কর।

৪। এই যুগের কয়েকজন শিল্পীর নাম কর।

৫। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও-র অবদান উল্লেখ কর।

৬। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান?

মৌখিক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ **এক নম্বর**

১। কোন্ সময় থেকে নবজাগরণের অভ্যুদয় কাল গণনা করা হয়?

২। নবজাগরণ প্রথমে কোথায় আত্মপ্রকাশ করে?

৩। 'ইউরোপের কৌটিল্য' কাকে বলা হয়?

৪। ইংরাজী দর্শনের আদিগুরু কে ছিলেন?

৫। কাকে আধুনিক উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক বলা হয়?

৬। ম্যাডোনা চিত্রাঙ্কনে কে দক্ষ ছিলেন?

৭। 'মোনালিসা' কার সৃষ্টি ?

৮। কাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক বলা হয় ?

৯। দূরবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন ?

১০। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারক কে ?

১১। বাঁ দিকে কয়েকজন গ্রন্থকার এবং ডানদিকে কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। সাজিয়ে লেখ—

(ক) মেকিয়াভেলি	(ক) ডেকামেরণ
(খ) চসার	(খ) ফেয়ারী কুইন
(গ) রাবেলে	(গ ডিভাইন কমেডি
(ঘ) বোকাচ্চিও	(ঘ) হ্যামলেট
(ঙ) এডমণ্ড স্পেন্সার	(ঙ) ক্যান্টারবেরী টেলস
(চ) দান্তে	(চ) দি প্রিন্স
(ছ) শেকস্‌পীয়ার	(ছ) ডন কুইক্‌জোট
(জ) সারভান্তিস	(জ) গারগ্যানচুয়া

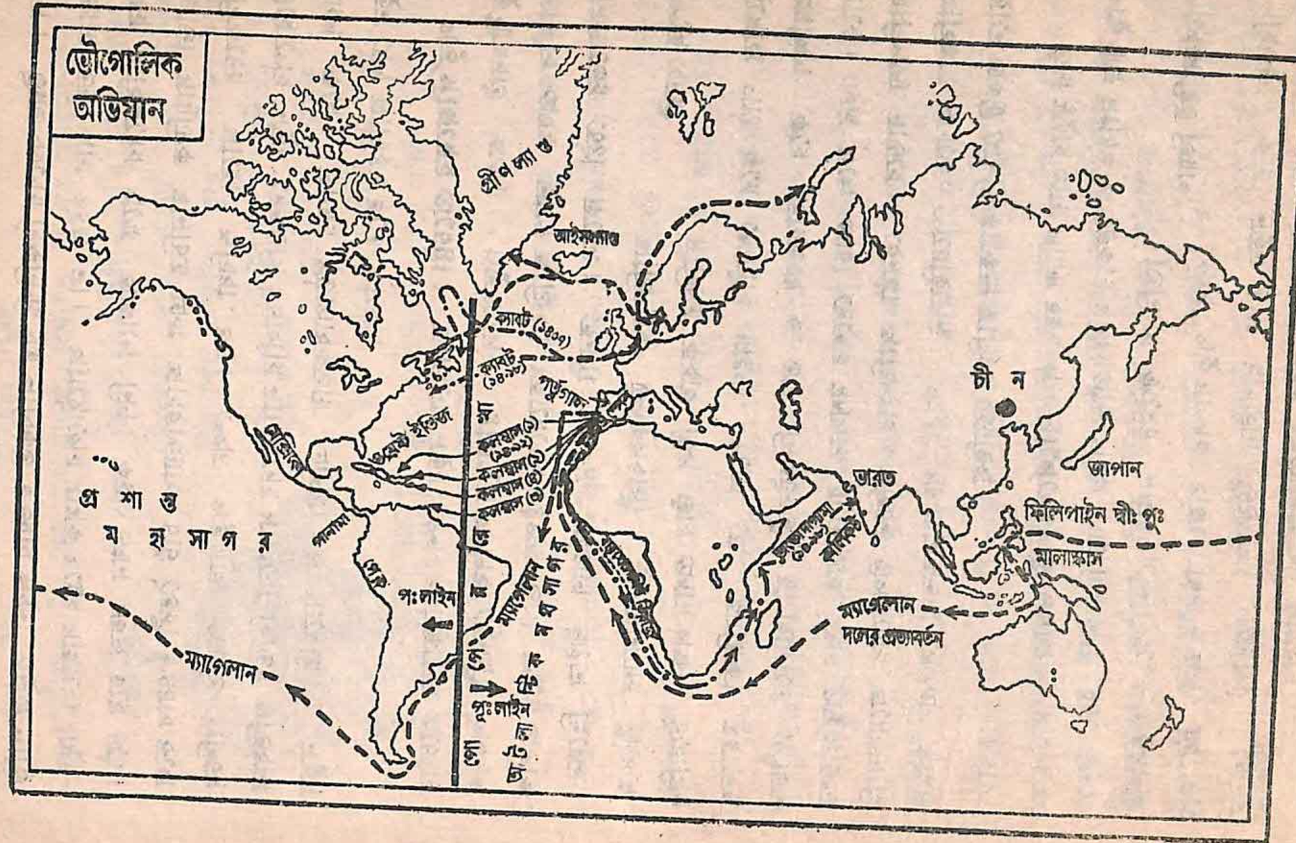
অধ্যায়

তিন

ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

নতুন দেশ আবিষ্কারে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও নবজাগরণের প্রভাব: মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগর ছিল ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থল। এই পথে ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীর শহরগুলি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তখন ইউরোপের বাজারে এশিয়ার মশলা ও বিলাসদ্রব্যের দারুণ চাহিদা ছিল। এই ব্যবসার উপর ইটালীর বণিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। তারা ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথে কোন নতুন ব্যবসায়ীকে প্রবেশ করতে দিত না। ক্রমে স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভেনিস প্রভৃতি শহরের বণিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তারা নতুন বাণিজ্য পথের সন্ধান করতে আরম্ভ করে।

নবজাগরণ ইউরোপের অধিবাসীদের মনে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। তারা এই সময়ে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত বাইরের দুয়ার ছিল তাদের কাছে রুদ্ধ। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা অজানাকে জানল, অনাবিষ্কৃত দেশকে আবিষ্কার করল। তাদের এই দেশ আবিষ্কারের পিছনে প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য ছিল — ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচার। তাছাড়া আরও অনেক সুযোগ সুবিধা ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথ সুগম করে দেয়। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত লোকদের মনে ধারণা জন্মায় যে, পৃথিবী


ভৌগোলিক অভিযান
গ্রীনল্যাণ্ড
আইসল্যাণ্ড
ক্যাবট (১৪৯৭)
ক্যাবট (১৪৯৮)
পর্তুগাল
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
কলম্বাস (১)
কলম্বাস (২)
কলম্বাস (৩)
কলম্বাস (৪)
চীন
জাপান
ভারত
ফিলিপাইন দ্বীঃ পুঃ
মালাক্কাস
ভাস্কো-দা-গামা
কালিকট
ম্যাগেলান
দলের প্রত্যাবর্তন
প্রশান্ত মহাসাগর
পানামা
পঃ লাইন
পূঃ লাইন
আটলান্টিক মহাসাগর

গোল। উন্নত ধরণের দিকনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় অকূল সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার ভয় আর রইল না। অ্যাষ্ট্রোলেব নামক যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র-বক্ষের নাবিকদের পক্ষে অক্ষাংশ নির্ণয় করা তখন সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া সামুদ্রিক মানচিত্র এবং আবহাওয়ার চার্ট তৈরী হওয়ার ফলে নাবিকদের আরো সুবিধা হয়। স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের নতুন দেশগুলি ইটালীর নাবিকদের সাহায্যে বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়া ও আমেরিকায় নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হতে থাকে।

পর্তুগীজদের প্রচেষ্টাঃ জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় পর্তুগীজরাই অগ্রণী। পর্তুগালের **রাজপুত্র নাবিক হেনরী** পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। হেনরী একজন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান ছিলেন।

রাজপুত্র হেনরী

আফ্রিকার উপকূলবাসী মুসলমানদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। টলেমির ভূগোল পাঠ করে হেনরীর ধারণা হলো যে, আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষ ও তার নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে পৌছান যাবে। এর ফলে প্রাচ্য দেশের মশলার ব্যবসায়ের উপর পর্তুগালের আধিপত্য বাড়বে। হেনরী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সাগ্রেস নামক স্থানে একটি নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে **বার্থেলোমিউ ডিয়াজ** নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন (১৪৮৮ খ্রীঃ)।

বার্থেলোমিউ ডিয়াজ

তিনি ঐ স্থানের নাম রাখেন 'ঝড়ের অন্তরীপ'। পরে পর্তুগালের রাজা **দ্বিতীয় জন** এই নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ'। কেননা এতদিনে তাঁর মনে প্রাচ্য দেশে যাওয়ার আশা জাগল।

পর্তুগীজ নাবিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন **ভাস্কো-দা-গামা**।



ভাস্কো-দা-গামা

তিনি ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে যাত্রা করে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন (১৪৯৮ খ্রীঃ)। কালিকট থেকে বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

ভাস্কো-দা-গামা

এর ঠিক দু'বছর বাদে **পেড্রো কেব্রাল** নামে আর একজন পর্তুগীজ নাবিক প্রচুর পণ্যসামগ্রী নিয়ে ভারতে আসেন (১৫০০ খ্রীঃ)। তাঁরই চেষ্টায় কালিকটে পর্তুগীজদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়।

পেড্রো কেব্রাল

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। এই সময়ে তিনি কোচিনে আর একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে দেশে ফিরে যান।

পর্তুগীজদের বাণিজ্য কুঠিগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে **আলফানসো আলবুকার্ক** ভারতে গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসেন। ক্রমে গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বোম্বাই, হুগলী প্রভৃতি স্থানেও পর্তুগীজদের কুঠি স্থাপিত হয়।

আলবুকার্ক

স্পেনীয়দের প্রচেষ্টা: পর্তুগালের ন্যায় স্পেনও সেদেশের নাবিকদের সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহ দেয়। এই সময়ে স্পেনের রাজা **ফার্ডিনাণ্ড** এবং রাণী **ইসাবেলার** সাহায্য নিয়ে ইটালীর নাবিক **কলম্বাস** এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস ছিলেন জেনোয়ার অধিবাসী। টলেমির ভূগোল পাঠ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল পশ্চিম দিকে জাহাজ চালালে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান যাবে। তিনি তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে যাত্রা

কলম্বাস

করে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কলম্বাস তখনও জানতেন না যে, নতুন মহাদেশটি আমেরিকা। তিনি বাহামা দ্বীপপুঞ্জকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ বলে ভুল করেছিলেন। আজও এই দ্বীপগুলি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামেই পরিচিত।


কলম্বাস

ইতিমধ্যে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে **আমেরিগো ভেসপুচি** নামে এক নাবিক দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে এসে উপস্থিত হন। সেই সময়ের লোকদের ধারণা ছিল যে আমেরিগো-ই এই নতুন মহাদেশটি আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁর নামেই নতুন মহাদেশটির নাম রাখা হলো আমেরিকা।

ভেসপুচি

ভাস্কো নুনেজ-ছ-বলবোয়া নামে আর একজন নাবিক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পানামার অন্তর্গত ড্যারিয়েন যোজক অতিক্রম করেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে অভিযান চালাবার কল্পনা করেন।


ম্যাগেলান

এর কিছুকাল পরেই **ম্যাগেলান** নামে এক পর্তুগীজ নাবিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে পড়েন। স্পেনের রাজা **পঞ্চম চার্লস** ম্যাগেলানকে পাঁচখানি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে তিনি প্রথমে ব্রাজিলে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে দক্ষিণ

আমেরিকা ঘুরে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। প্রশান্ত মহাসাগর নামটি তিনি-ই রেখেছিলেন। অনেকদিন পরে ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু দ্বীপবাসীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে ম্যাগেলান নিহত হন। শেষ পর্যন্ত তাঁর একটিমাত্র জাহাজ (ভিক্টোরিয়া) ভারত মহাসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে তিন বছর বাদে স্পেনে ফিরে আসে। এইভাবে ম্যাগেলানের কয়েকজন সঙ্গী সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করে।

ম্যাগেলান

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতি: নতুন নতুন দেশ আবিকারের ফলে অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এর ফলে মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার কথাও আমরা জানতে পারি। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত ছিল। তাদের প্রাচীন সভ্যতার নাম 'আস্তেক সভ্যতা আর আস্তেক সভ্যতার লোকদের বলা হত মায়া। মায়াগণ প্রস্তরের সাহায্যে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী নির্মাণ করতে জানত। তবে তারা লোহার ব্যবহার জানত না। তাদের বহু নগর ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তারা কৃষিকার্য ও হস্তশিল্পে পারদর্শী ছিল। পেরুদেশে 'ইন্‌কা সভ্যতা' নামে আর একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ইন্‌কাদের রাজধানীতে প্রচুর ধনরত্ন ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ বাস্তবে পরিণত হল। ম্যাগেলানের পরে ইংরাজ নাবিক ড্রেক জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এর ফলে ভাল করেই প্রমাণিত হল যে পৃথিবী গোল।

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পর্তুগীজগণ প্রাচ্যের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। স্পেনীয়গণও দেশ জয় করতে থাকে। তবে তাদের অভিপ্রায় ছিল ধন-রত্ন লুণ্ঠন করা। এই সময়ে কোর্টেস ও পিজারো নামে স্পেনের দু'জন অভিযাত্রী মেক্সিকো ও

পেরু জয় করে। স্পেনের অভিযাত্রীগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিগুলির অধিকার লাভ করে স্পেন বিপুল ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। স্পেনদেশীয় বণিকগণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের এইসব খনিতে মজুরের কাজে নিযুক্ত করেন।

ক্রমে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ—ইউরোপের আরও তিনটি জাতি ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের প্রভাব প্রাচ্যে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। ইংরাজ ও ফরাসীরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য এবং পরে সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। তারা উত্তর আমেরিকাতেও উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ওলন্দাজরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ইংরাজদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ এই সময়ে উপনিবেশগুলি থেকে ইউরোপীয় বণিকগণ প্রচুর ধন-সম্পদ আহরন করে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য ভাণ্ডার বণিক ও শাসক গোষ্ঠীকে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে তোলে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে স্বর্ণের পরিমাণ দ্বিগুণ এবং রৌপ্যের পরিমাণ বেড়ে দশগুন হয়েছিল। এই ঐশ্বর্যের দৌলতে এবং বণিক গোষ্ঠীর সহায়তায় ইউরোপের শাসক শ্রেনীর দ্বারা জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান সম্ভব হয়েছিল।

সময়পঞ্জী

বার্থেলোমিউ ডিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার—	১৪৮৮ খ্রীঃ
কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার—	১৪৯২ খ্রীঃ
ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আগমন—	১৪৯৮ খ্রীঃ
পেড্রো কেব্রালের ভারতে আগমন—	১৫০০ খ্রীঃ
ম্যাগেলান ও তাঁর সঙ্গীদের ভূ-প্রদক্ষিণ—	১৫১৯—১৫২২ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৯নম্বর**

১। নতুন দেশ আবিষ্কারের পটভূমিকা আলোচনা কর।
২। পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় নতুন দেশ আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা কর।
৩। স্পেনীয়দের প্রচেষ্টায় কিভাবে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হয়েছে তার বিবরণ দাও।
৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল বর্ননা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৩নম্বর**

১। ভৌগোলিক আবিষ্কার কেন সম্ভব হয়েছিল?
২। নতুন দেশ আবিষ্কারে রাজপুত্র নাবিক হেনরীর ভূমিকা উল্লেখ কর।
৩। ভাস্কো-দা-গামার ভারত আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী লেখ।
৫। ম্যাগেলানের ভূ-প্রদক্ষিণ বর্ননা কর।

মৌখিক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ **এক নম্বর**

১। (ক) সাগ্রেসে নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র কে স্থাপন করেছিলেন?
২। উত্তমাশা অন্তরীপ কে আবিষ্কার করেন?
৩। ভাস্কো-দা-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন?
৪। কলম্বাস কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন?
৫। কার নামে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয়?
৬। কোন্ স্পেনীয় অভিযাত্রী মেক্সিকো জয় করেন?

(খ) সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

১। অ্যাষ্ট্রোলেবকম্পাস নামক যন্ত্রের সাহায্যে নাবিকদের পক্ষে অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
২। ভারতে পর্তুগীজ কুঠির গভর্ণর ছিলেন পেড্রো কেব্রাল/আলবুকার্ক।
৩। মায়াগণ লোহার ব্যবহার জানত/জানত না।
৪। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বলা হত রেড ইণ্ডিয়ান/ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

অধ্যায়

চার

ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরানো প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে তখন বহু অনাচার ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। এই সব অনাচার ও দুর্নীতি দূর করে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার ইচ্ছা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ,প্রবল হয়ে ওঠে। এই সংস্কারের আগ্রহ থেকেই ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন জন্মলাভ করে। ক্রমে তা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

(ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কারকগণের প্রতিবাদঃ এই সময়ে ধর্মগুরু পোপ ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মীয় আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েন এবং দুর্নীতিপূর্ণ জীবন-যাপন আরম্ভ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আবার উপযুক্ত শিক্ষারও অভাব ছিল। এমন কি মঠবাসী যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা দুর্নীতি ও অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। পোপ ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণ অর্থের লোভে ধর্মযাজকের পদ বিক্রয় করতেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপরাধেও তাঁরা অপরাধী ছিলেন। তাঁদের প্রধান দুর্নীতিপূর্ণ কাজ হল **'ইনডালজেন্স'** বিক্রয়। 'ইনডালজেন্স' কথার অর্থ হল মার্জনা পত্র। কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করেও যদি পোপের ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করত, তাহলেই সে মার্জনা-পত্র পাবার অধিকারী হত। এই মার্জনা-পত্র বিক্রয়ের জন্য পোপ বিভিন্ন

দেশে তাঁর প্রতিনিধি পাঠাতেন। টেটজেল নামক একজন প্রতিনিধি জার্মানির বিভিন্ন স্থানে ঘুরে অজ্ঞ জনসাধারণকে স্বর্গে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মার্জনা-পত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য চালান। ধর্মের নামে এইসব অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মসংস্কারক প্রবল প্রতিবাদ জানান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস** এবং **মার্টিন লুথার**।

জন ওয়াইক্লিফ

অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা দার্শনিক জন ওয়াইক্লিফ ছিলেন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি ইংলণ্ডে আবির্ভূত হন। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাচার ও দুর্নীতি প্রবেশ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। পোপের অর্থ সংগ্রহের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ জানান এবং ধর্ম সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনসাধারণ যাতে ধর্মীয় ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয় এবং তারা যাতে ধর্মের মূলকথা ভালভাবে বুঝতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অক্সফোর্ডের সহকর্মীদের সাহায্যে বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন।

প্রেগের জন হাস ছিলেন ওয়াইক্লিফের পথ অনুসরণকারীদের অন্যতম। ওয়াইক্লিফের ধর্মীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বোহেমিয়াতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল মতবাদ গড়ে তোলেন। কিন্তু এই কাজের জন্য তাঁকে মর্মান্তিক ফলভোগ করতে হয়েছিল। বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

মার্টিন লুথার

মার্টিন লুথার ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে লুথার খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠে যোগদান করেন। মঠে থাকাকালে তিনি সন্ন্যাসীদের রীতি-নীতি যথাযথ ভাবে পালন করে চলতেন। কিছুদিন পরে তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

পোপের নির্দেশে তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে জার্মানিতে যখন 'ইনডালজেন্স' বিক্রয় হতে থাকে, তখন লুথার তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ করেন। তিনি ইনডালজেন্সের বিরুদ্ধে ল্যাটিন ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সেগুলি উইটেনবার্গ গীর্জায় প্রচার করেন। এই প্রবন্ধগুলি জার্মান ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়েছিল। লুথারের এই প্রচার কার্যের প্রভাবে জার্মানিতে ইনডালজেন্স বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায়।



মার্টিন লুথার

লুথারের এইসব কার্যাবলীতে পোপ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে 'পতিত' বলে ঘোষণা করেন। এদিকে লুথারের জনপ্রিয়তা বেশ বৃদ্ধি পায়। তিনি পোপের নির্দেশ পত্রকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন এবং প্রকাশ্য রাজপথে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। পোপ এতে আরও ক্রুদ্ধ হন এবং এই ঘটনাকে ধর্মদ্রোহ বলে মনে করলেন। কিন্তু তিনি লুথারকে শাস্তি দেবার জন্য ওয়ার্মস-এ এক সভার ব্যবস্থা করেও তাঁকে শাস্তি দিতে পারলেন না। কারণ জার্মানির অনেক ভূ-স্বামী এবং রাজা তাঁর পক্ষে ছিলেন। স্যাক্সনীর রাজার আশ্রয়ে থাকাকালীন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। উইটেনবার্গে ফিরে এসে লুথার ধর্মসংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন।

লুথারের ধর্মমতের সহজ ও সরল কথা হল—অর্থব্যয় নয়, অনুতাপই পাপের আসল প্রায়শ্চিত্ত; ধর্ম বিষয়ে সকলেই স্বাধীন, সে জন্য পোপের অধীনতা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। বাইবেল থেকেই ধর্মের মূলকথা জানা যায়।

(খ) **ফলাফল**—ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান জগৎ দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ে পৃথক হয়ে পড়ে। পুরাতন পন্থীরা অর্থাৎ

পোপের মতাবলম্বীগণ **'রোমান ক্যাথলিক'** রয়ে গেলেন, আর নতুন মতাবলম্বীগণ অর্থাৎ লুথারের সমর্থনকারীরা **'প্রোটেস্ট্যান্ট'** নামে পরিচিত হলেন। 'প্রোটেস্ট' অর্থাৎ প্রতিবাদ থেকেই প্রোটেস্ট্যান্ট কথার উৎপত্তি।

লুথারের ধর্মমতের সহজ ও সরল অনুশাসনগুলি জার্মানির ধার্মিক ব্যক্তিগণের অনুমোদন লাভ করে এবং শাসক সম্প্রদায়ও একে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। স্যাক্সনী, লুনবুর্গ, হেসে, ব্রাণ্ডেন বুর্গ ও অ্যানহাল্ট প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা প্রোটেস্ট্যান্ট অর্থাৎ লুথারের ধর্মমত অবলম্বন করে একটি প্রোটেস্টান্ট রাজ্য সমবায় সংগঠন করেন। তবে উত্তর জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটলেও দক্ষিণ জার্মানি পোপের প্রতি অনুগত থেকে যায়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুধু জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে। সুইজারল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন **জুইংলী**। ফরাসী দেশীয় সংস্কারক **ক্যালভিন** ছিলেন আবার চরমপন্থী। লুথারের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য ছিল। ক্যালভিন ছিলেন জেনেভার প্রধান ধর্ম প্রচারক। তিনি আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনের আদর্শ এখানে প্রচার করেন। সেজন্য ক্যালভিনের সমর্থকরা জেনেভাকে 'দেবপুরী' ('সিটি অফ গড') বলত। ক্যালভিনের ধর্মমতের প্রভাব নেদারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে দারুণভাবে অনুভূত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটে। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী প্রথমে পোপের সমর্থক থাকলেও পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তিনি পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অষ্টম হেনরী তাঁর প্রথমা পত্নী রাণী **ক্যাথারিনের** সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পোপ এই বিবাহ-বিচ্ছেদে অনুমতি দেন নি। শেষ পর্যন্ত হেনরী পার্লামেন্টের সাহায্যে ইংলণ্ড থেকে পোপের কর্তৃত্ব দূর করেন এবং ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে **অ্যানবোলান** নামে এক সুন্দরী

অষ্টম হেনরী

যুবতীকে বিয়ে করেন। ইংলণ্ডে নতুন চার্চের সৃষ্টি হল। এর নাম হল 'চার্চ অফ ইংলণ্ড' আর হেনরী হলেন এই চার্চের প্রধান। হেনরী ছিলেন শুধু পোপ-বিরোধী, আসলে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রায় সব অনুশাসনই মেনে চলতেন। এই সময়ে হেনরী ইংলণ্ডের মঠগুলি ধ্বংস করে প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের ধর্ম বিরোধের মীমাংসা ঘটে।

(গ) ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার :

(১) আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি : ধর্মসংস্কার আন্দোলন সারা ইউরোপে যখন ব্যাপক আকার ধারণ করল, তখন ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টি পড়ল নিজেদের অধঃপতিত অবস্থার দিকে। তারা নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে তারা যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক মান ফিরিয়ে আনতে এবং নিজেদের সুসংবদ্ধ করতে উদ্যোগী হল। ধর্মীয় জীবনে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস, দুর্নীতি ও অনাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা বদ্ধপরিকর হল। যে সব অনাচার ধর্মযাজকদের জীবনকে এতদিন কলুষিত করেছে তা উচ্ছেদ করতে গিয়ে তারা প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করত এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে ধর্মীয় বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হত। **'ইনকুইজিসন'** অর্থাৎ যাজকদের বিচার সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হত। প্রয়োজন হলে অপরাধীকে পুড়িয়ে মারা হত।

এই সময়ে **ইগনেসিয়াস লয়লা** নামে একজন আদর্শবান ব্যক্তি **জেসুইট সম্প্রদায়** গঠন করেন (১৫৩৪ খ্রীঃ)। এই সম্প্রদায় পোপের অনুমোদন লাভ করে (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। রোমান ক্যাথলিক চার্চের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক মান উন্নত করাই ছিল জেসুইট সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান কাজ। চার্চকে ভালভাবে গড়ে তুলতে নতুন কর্মী

নিয়োগ করা হল এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। শিক্ষা-কালীন শিক্ষার্থীদের কঠোরতা এবং নিয়মানুবর্তিতা পালন করতে হত। চার্চের আভ্যন্তরীণ ত্রুটি মুক্ত করে জেসুইটগণ এইবার বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে **'কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট'** (১৫৪৫-১৫৬৩ খ্রীঃ)-এর ভূমিকাও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। চার্চের সংস্কার সাধনের নিমিত্ত এই কাউন্সিল বহু রকম বিধি প্রবর্তন করেছিল। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও মজবুত হয়। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চের মূল মতবাদ পুনরায় স্বীকৃত হয়।

২। **পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ**—ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্রসংঘের সহিত সম্রাট পঞ্চম চার্লসের এই রকম এক ধর্মযুদ্ধ হয়। লুথারের মৃত্যুর (১৫৪৬ খ্রীঃ) পর অবশ্য স্যাক্সনীর রাজা **মরিস** প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্য সমবায় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেন না এই সময়ে ধর্মের চেয়েও রাজনীতি ও আপন স্বার্থের দিকেই রাজাদের ঝোঁক ছিল বেশী।

এদিকে লুথারের মৃত্যু, মরিসের দলত্যাগ এবং সর্বোপরি ক্যাথলিক চার্চের শক্তিবৃদ্ধিতে পোপের মনোবল বেড়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা হলো ক্যাথলিক পন্থী সম্রাট পঞ্চম চার্লস স্বয়ং পোপের পক্ষে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পঞ্চম চার্লস তখন নেদারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্মানির কিয়দংশ, সিসিলি, নেপেলস্ ও স্পেন সম্বলিত প্রায় অর্দ্ধেক ইউরোপের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যকে বলা হত 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য'।

প্রায় ন'বছর ধরে এই ধর্মযুদ্ধ চলার পর নতুন পোপ তৃতীয় জুলিয়স

এবং পঞ্চম চার্লসের চেষ্টায় প্রোটেস্টান্টদের অগ্সবার্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এই চুক্তির ফলে জার্মানিতে লুথারের মতবাদ স্বীকার করে নেওয়া হয়। তাছাড়া আরও একটি নীতি গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক রাজ্যের রাজাই ঠিক করে দেবেন কোন রাজ্যে কোন ধর্মমত প্রবর্তিত হবে। এইভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে রাজার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

পঞ্চম চার্লস



পঞ্চম চার্লস

(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা :—হল্যাণ্ডের বর্তমান নাম নেদারল্যাণ্ড। পূর্বে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্লাণ্ডার্সকে একসঙ্গে নেদারল্যাণ্ড বলা হত। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ জাতির মত নেদারল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ অধিবাসী এই ধর্ম গ্রহণ করে।

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত হয়ে যায়, তখন হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম তাঁর পুত্র স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের ভাগে পড়ে। দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। তাঁর নেদারল্যাণ্ডবাসী প্রজারা মার্টিন লুথারের নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে তিনি কিছুতেই তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উচ্ছেদেরজন্য **ডিউক আল্ভা** নামক এক নির্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানকার প্রধান শাসনকর্তা করে পাঠালেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ



দ্বিতীয় ফিলিপ

আলভা নেদারল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যান্টদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রথমেই তিনি তাদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করেন। অত্যধিক করের চাপে ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। আলভার অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বণিক-গোষ্ঠী পালিয়ে যেতে চাইল। আল্‌ভা আরও রেগে গিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করতে লাগলেন। শহরের পর শহর তিনি পুড়িয়ে দিলেন। সর্বত্র শুরু হলো লুণ্ঠন।

উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ

ওলন্দাজগণ এইবার শাসকশ্রেণীর অত্যাচারকে প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর হন। এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন বীর দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম **উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ** বা **উইলিয়ম দ্য সাইলেণ্ট**। অরেঞ্জ বংশের লোক বলে তিনি **উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ** নামে পরিচিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য উইলিয়মের নেতৃত্বে শুরু হল ওলন্দাজদের বিপ্লব। দেশবাসী তারই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইভাবে আলভার শিক্ষিত স্প্যানিশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী ওলন্দাজের সাধারণ অধিবাসীগণ অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ে কাউন্ট এগমমন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ওলন্দাজগণ এইবার অন্য কৌশল অবলম্বন করল। তারা বাঁধগুলি ভেঙ্গে দিলে উত্তর সাগরের জলে দেশ ভেসে যেতে লাগল।



উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ

এরফলে স্পেনের বহু সৈন্য জলে ডুবে মরল, তারা আর যুদ্ধ চালাতে পারেনি। ওলন্দাজদেরও অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তথাপি তারা স্পেনের সৈন্যদলের হাত থেকে রক্ষা পেল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের শত্রুতা চলছিল। তাই ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ এই যুদ্ধে ওলন্দাজদের সাহায্য করেছিলেন। জার্মানীর কোন কোন প্রোটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্রও এই যুদ্ধে উইলিয়মকে সাহায্য করেছিল। স্পেন ওলন্দাজদের দমাতে না পেরে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই তাদের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। ওলন্দাজগণ তাদের প্রিয় নেতা উইলিয়ামকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ উইলিয়ম তাতে রাজী হলেন না। তখন সেখানে **সাধারণতন্ত্র শাসন** প্রতিষ্ঠিত হলো।

দ্বিতীয় ফিলিপ উইলিয়মকে পরাজিত করতে না পেরে একজন আততায়ীকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করান (১৫৮৪ খ্রীঃ)। তাঁর মৃত্যুর পর ওলন্দাজদের নেতৃত্ব দেন তাঁর পুত্র মরিস। ওলন্দাজদের স্বাধীনতার যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। তারা ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়নি। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে** স্বাধীন ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্র স্বীকৃতি পায়। শীঘ্রই ওলন্দাজগণ এক বিরাট নৌ-শক্তির সাহায্যে পূর্ব-ভারতীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ওলন্দাজদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হার্লেম, আল্কমার ও লেডেন প্রভৃতি নগরের অধিবাসীদের আত্মত্যাগ আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওলন্দাজদের এই চরম বিপদের ফলেও দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডের (পরবর্তীকালে অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ড নামে পরিচিত) অধিবাসীরা তাদের এতটুকুও সাহায্য করেনি। দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড ছিল ক্যাথলিক পন্থী। তাই স্পেনের নির্দেশেই তারা নীরব ছিল। এই দেশটিকে বলা হত বেলজিয়াম সাম্রাজ্য।

প্রোটেস্টাণ্ট ইংলণ্ড এবং এর চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনার জন্য দ্বিতীয় ফিলিপের প্রয়াস: ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকাল (১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ) স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আমলেই ইংলণ্ডের ধর্মবিরোধের মীমাংসা হয়। তিনি রোমান ক্যাথলিক

ও প্রোটেস্ট্যান্ট মতের মাঝামাঝি হিসাবে ইংলণ্ডে জাতীয় চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতকেও পুরাপুরি সমর্থন করেননি, আবার পোপের কর্তৃত্বও স্বীকার করেননি। ক্যাথলিক মতবাদের বিতর্কিত বিষয়গুলি তিনি ত্যাগ করেন। মোট কথা ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী।

রাণী এলিজাবেথ

এই সময়ে স্পেনের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান সম্রাট। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিকপন্থী। দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ধর্মীয় নীতি মোটেই পছন্দ করলেন না। শীঘ্রই তাঁদের মধ্যে বিরোধ শুরু হল। এই বিরোধের মূলে আরও অনেক কারণ ছিল।

এলিজাবেথ পঁচিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের রাণী হয়েছিলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে, এলিজাবেথ তাতে আপত্তি জানান এবং সারাজীবন অবিবাহিতা থাকেন।

স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবী করলে, এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। মেরী ছিলেন ক্যাথলিক। তাই স্কটল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী প্রজারা তাঁকে পছন্দ করত না। তাছাড়া তাঁর বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও প্রজারা অসন্তুষ্ট ছিল। প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেরী যুদ্ধে পরাজিত হলে প্রজারা তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করলো। তখন অন্য কোন উপায় না দেখে মেরী ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে রাণী এলিজাবেথের আশ্রয় নিলেন। এলিজাবেথ তাঁকে আশ্রয় দিলেও বন্দীভাবেই রেখেছিলেন।

ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথলিকরা এই সময় এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মেরী এতে যোগ দিয়েছেন, এই অভিযোগে মেরীর প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনায়ও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এলিজাবেথের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

দ্বিতীয় ফিলিপ যখন প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী ওলন্দাজদের উপর দমন-নীতি গ্রহণ করেন, তখন ওলন্দাজগণ বাধ্য হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু

করেছিল। সেই সময় ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে ওলন্দাজদের সাহায্য করেছিলেন। এলিজাবেথের উপর ফিলিপ এই ব্যাপারেও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

এইসব কারণে ফিলিপ এলিজাবেথকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইলেন। ফিলিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের জাতীয় চার্চ এবং সেখানকার প্রটেস্ট্যাণ্টদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। এজন্য তিনি ইংলণ্ড জয়ের পরিকল্পনা করেন।

স্প্যানিশ আর্মাডা ঃ ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণ করার জন্য এক বিরাট নৌ-বহর তৈরী করলেন। এতে প্রায় ১৩২ খানি জাহাজ ছিল। এই নৌ-বহর ইতিহাসে 'ইন্‌ভিনসিবল্ আর্মাডা' (অজেয় নৌ-বহর) বা 'স্প্যানিশ আর্মাডা' নামে পরিচিত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্প্যানিশ আর্মাডা ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করল।

ড্রেক

এই সময়ে ইংলণ্ডেরও বহু জাহাজ ছিল। সেগুলি আকারে ছোট এবং স্পেনের জাহাজের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী। ইংরাজ নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন **লর্ড হাওয়ার্ড**। তাঁর অধীনে ছিলেন **ড্রেক, হকিন্স** এবং **ক্রোবিশার** প্রমুখ সেনাপতিগণ। ড্রেক স্প্যানিশ আর্মাডার ধ্বংস সাধনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

আর্মাডা

আর্মাডা ইংলণ্ডের উপকূলে এলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংরাজদের ছোট ছোট জাহাজগুলি দল বেঁধে স্পেনের নৌবহরের কাছে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে আসত। স্পেনের বড় বড় জাহাজগুলি তাদের ধরতে পারত না। এইভাবে স্পেনের জাহাজ ক্যালে বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। এখানে ইংরাজ সৈন্যরা নতুন ফন্দি আবিষ্কার করল। একদিন রাত্রে তারা কয়েকটি পুরানো জাহাজে আগুন লাগিয়ে সেগুলি স্পেনের নৌ-বহরের দিকে ছেড়ে দিল। স্পেনের নৌ-সেনাপতি **মেডিনা সিডোনিয়া** তখন বিপদের আশংকা করে তাড়াতাড়ি জাহাজ নিয়ে বন্দর ছেড়ে পালাতে লাগল।

এইভাবে যখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, তখন ইংরাজদের লুকানো জাহাজ তাদের ধরে এক এক করে ডুবিয়ে দিতে লাগল। এরপর আরম্ভ হলো ভীষণ ঝড়। ঝড়ের দাপটেও তাদের বহু জাহাজ ডুবে গেল। মাত্র কয়েকটি জাহাজ স্পেনে ফিরে আসতে পেরেছিল। এইভাবে বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস হলো।

এইভাবে দ্বিতীয় ফিলিপের গঠিত অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এদিকে ইংরাজদের নৌ-শক্তির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কালপঞ্জী

জন ওয়াইক্লিফ	১৩২৪—১৩৮৪ খ্রীঃ
মার্টিন লুথার	১৪৮৩—১৫৪৬ খ্রীঃ
জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা	১৫৩৪ খ্রীঃ
কাউন্সিল অফ ট্রেন্ট	১৫৪৫—১৫৬৩ খ্রীঃ
অষ্টম হেনরী	১৫০৯—১৫৪৭ খ্রীঃ
রাণী এলিজাবেথ	১৫৫৮—১৬০৩ খ্রীঃ
পঞ্চম চার্লস	১৫১৯—১৫৫৬ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ফিলিপ	১৫৫৬—১৫৯৮ খ্রীঃ
অগস্‌বার্গ চুক্তি	১৫৫৫ খ্রীঃ
ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি	১৬৪৮ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ **৯নম্বর**

১। ক্যথলিক চার্চের দুর্নীতি ও অনাচারগুলি কি কি? এইগুলির বিরুদ্ধে ধর্ম-সংস্কারকগণ কিভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন?

২। ইউরোপের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফল বর্ণনা কর।

৩। ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।

৪। ধর্মযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। ওলন্দাজদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত কর।
৬। কি কি কারণে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে দ্বিতীয় ফিলিপের বিরোধ বাধে ?
৭। স্প্যানিশ আর্মাডা কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **উত্তর**

১। 'ইনডালজেন্স' বলতে কি বোঝ ?
২। টীকা লেখ : (ক) জন ওয়াইক্লিফ, (খ) জন হাস, (গ) জন ক্যালভিন।
৩। জার্মানিতে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আলোচনা কর।
৪। ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার সাধনে জেসুইট সম্প্রদায়ের অবদান বর্ণনা কর।
৫। ওলন্দাজদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উইলিয়াম অফ্ অরেঞ্জের ভূমিকা উল্লেখ কর।
৬। টীকা লেখ : (ক) অগ্সবার্গ চুক্তি, (খ) ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি, (গ) স্প্যানিশ আর্মাডা।

বিষয়মুখী প্রশ্ন - - - - - - - - - - - - - - - **এক নম্বর**

১। **দু'এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) ইউরোপের ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন ?
(খ) সুইজারল্যাণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কে পরিচালনা করেছিলেন ?
(গ কার আমলে ইংলণ্ডে জাতীয় চার্চ গঠিত হয় ?
(ঘ) ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের যুদ্ধে স্পেনের নৌ-সেনাপতি কে ছিলেন ?

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে √ চিহ্নটি দাও :**

(ক) জন ওয়াইক্লিফ/মার্টিন লুথার ছিলেন ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত।
(খ) ক্যালভিনের সমর্থকরা সুইজারল্যাণ্ড/জেনেভাকে বলত 'দেবপুরী'।
(গ) জেসুইট সম্প্রদায় গঠন করেন ইগনেসিয়াজ লয়লা/জন হাস।
(ঘ) স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট/ক্যাথলিক পন্থী।

অধ্যায়

পাঁচ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের মূল কারণঃ টিউডর রাজাদের আমলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয়। নবজাগরণের প্রভাবে সেখানে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। সেখানে পোপের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটে। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর মালিকগণ এই সময় থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চেষ্টা করে। এতদিন ধরে রাজা ও অভিজাতবর্গই সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এইবার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাজা ও অভিজাত-বর্গকে পরাজিত করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে পার্লামেন্ট ক্ষমতা হস্তগত করে। এই ঘটনাই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব।

বিভিন্ন কারণে এই সময়ে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। স্টুয়ার্ট রাজাদের অযোগ্যতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। টিউডর রাজারা এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের সুশাসনে সকল শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট ছিল। বিশেষ করে রাণী এলিজাবেথ খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলতেন।

কিন্তু স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন অন্যরকম। তাঁরা স্কটল্যাণ্ড থেকে এসে উত্তরাধিকার সূত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ডের

সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ছিল না। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এই সময়ে যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা হয় তার প্রতি স্টুয়ার্ট রাজাদের কোনরকম সহানুভূতি ছিল না।

স্টুয়ার্ট বংশের রাজারা বিশ্বাস করতেন যে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই তাঁরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে দেশ শাসন করতেন। তাঁদের মতে কোন প্রজারই রাজকার্যে সমালোচনা করার অধিকার নেই। রাজাকে সমালোচনা করার অর্থই হলো ঈশ্বরকে অমান্য করা। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁদের এই যুক্তি মানতে রাজী ছিল না।

ইংলণ্ডের জাতীয় মহাসভার নাম পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্টের প্রধান কাজই ছিল রাজাকে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহে সম্মতি দেওয়া। কালক্রমে পার্লামেণ্ট দাবী করে যে, এর অর্থ সাহায্য না করার অধিকারও আছে। স্টুয়ার্ট রাজারা পার্লামেণ্টের অনুমতি না নিয়েই অনেক সময়ে নতুন কর আদায় করতেন।

যাঁরা স্টুয়ার্ট রাজগণের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতেন তাঁরা বিনা বিচারে বন্দী হতেন। বিনা বিচারে বন্দী করার অধিকারের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

এই সময়ে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পিউরিটান অর্থাৎ চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যাণ্ট। স্টুয়ার্ট রাজারা পিউরিটান মতবাদের বিরোধী ছিলেন। পিউরিটানদের প্রতি স্টুয়ার্ট রাজগণের বিরূপ মনোভাব পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক আরও তিক্ত করে তুলল।

স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম জেমস্ সিংহাসনে আরোহন করেই স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তিনি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে দৈবস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্যরা এই গণতন্ত্র বিরোধী নীতি মানতে চাননি। প্রথম জেমস্ আট বছর পার্লামেণ্ট না ডেকে দেশ শাসন করেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মনে করলেন, রাজা পার্লামেণ্ট না ডেকে তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। ফলে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

প্রথম জেমস্

গৃহযুদ্ধ : প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের আমলে

রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রথম চার্লসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট একটি

প্রথম চার্লস

আবেদন পত্রে কতকগুলি অধিকার দাবী করে। এই আবেদন পত্রকে 'অধিকারের আবেদন পত্র' (পিটিসন অফ রাইটস) বলা হয়। এই আবেদনপত্রে পার্লামেণ্টের সম্মতি না নিয়ে কর আদায় ও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ করা হল। চার্লস অধিকারের আবেদন মেনে নিলেও এর শর্তগুলি মেনে চলার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি প্রায় এগার বছর পার্লামেন্ট না ডেকেই দেশ শাসন করেন। কিন্তু পরে অর্থাভাবের জন্য ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পার্লামেন্ট ডাকতে হয়েছিল।



প্রথম চার্লস

এই পার্লামেন্ট দীর্ঘ কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে একে 'দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্ট' (লং পার্লামেন্ট) বলা হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট অর্থ মঞ্জুর তো করলো না বরং রাজার বে-আইনী কাজের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। চার্লস জন হ্যাম্পডেন, জন পিম প্রমুখ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যকে বন্দী করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। তখন পার্লামেন্টের সঙ্গে চার্লসের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই যুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' (সিভিল ওয়ার) বলা হয়।

ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ : এই সময়ে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষ। হ্যাম্পডেন ও পিমের মৃত্যুর পর ক্রমওয়েল পার্লামেন্টের পক্ষে যুদ্ধের

অলিভার ক্রমওয়েল

নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ব ইংলণ্ডের এক গ্রাম্য জমিদারের পরিবারে অলিভার জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্য হন। ক্রমওয়েল ছিলেন

একজন সুদক্ষ যোদ্ধা; তাঁর সৃষ্ট অশ্বারোহী বাহিনী 'লৌহ পার্শ্ব' (আয়রণ সাইড) নামে পরিচিত ছিল। ধর্মের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশই পালন করছেন।

নেসবির যুদ্ধে চার্লস পরাজিত হন। চার্লসের বিচারের জন্য পার্লামেন্ট একটি উচ্চ আদালত গঠন করে। চার্লস কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। এই আদালতের বিচারকগণ চার্লসকে অত্যাচারী শাসক, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী ও জনসাধারণের শত্রু বলে ঘোষণা করে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। লণ্ডনে ওয়েস্টমিনিস্টার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে তাঁকে হত্যা করা হয়।

চার্লসের মৃত্যুর পর দশ বছর ক্রমওয়েলই ছিলেন ইংলণ্ডের ভাগ্যবিধাতা। এই সময়ে দেশে যে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় তাকে বলা হত **কমন্‌ওয়েলথ বা সাধারণতন্ত্র**। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসনের ব্যাপারে জন-সাধারণের কোন ক্ষমতাই ছিল না। ক্রমওয়েলই তখন নিজের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়।

স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা আর পছন্দ করল না। তারা প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসন গ্রহণ করতে আহ্বান করে। পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লসকে নিজের দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশে ফিরে এলে তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে ইংলণ্ডে আবার **রাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় চার্লস



দ্বিতীয় চার্লস

দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তিনি কৌশলী ও জনপ্রিয় রাজা ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসন লাভ করেন। তিনি

উদ্ধত প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে আবার পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হয়।

গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) : দ্বিতীয় জেমস ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যেসব আইন ছিল, তিনি সেগুলি তুলে দেবার চেষ্টা করেন। তিনি ক্যাথলিকদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন। এতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে হলো যে জেমস ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় জেমস



দ্বিতীয় জেমস্

দ্বিতীয় জেমসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ইংলণ্ডের জনসাধারণ মনে করত যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা মেরী সিংহাসন পাবেন। শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত দল মিলিত হয়ে জেমসের জামাতা ও হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশের উইলিয়মকে ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করতে আহ্বান করে।

উইলিয়াম ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসেন এবং সিংহাসন গ্রহণ করেন। জেমস বিনা প্রতিবাদে দেশ থেকে পলায়ন করেন। বিনা রক্তপাতে এই বিপ্লব সংঘটিত হয় ; কেননা জেমস বিনা যুদ্ধেই পলায়ন করেছিলেন। তাই ইতিহাসে এই বিপ্লবের নাম '**রক্তপাতহীন বিপ্লব**' বা '**গৌরবময় বিপ্লব**'।

'বিল অফ রাইট্‌স' (১৬৮৯খ্রীঃ) এবং অন্যান্য ফলাফল : উইলিয়ম ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে পার্লামেন্টের অধিকার সমূহ স্বীকার করে নেন এবং এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এর ফলেই ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'অধিকারের আইন' (বিল অফ রাইট্স) পাশ হয়। এই

আইনের ফলে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ চূড়ান্তভাবে মিটে গেল। এর পর থেকে রাজা রাজত্ব করতেন বটে, কিন্তু দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা এল পার্লামেন্টের হাতে।

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে আরও স্থির হল যে, ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বংশগত ব্যবস্থার পরিবর্তে পার্লামেন্টের সম্মতি অনুযায়ী হবে। আর এখন থেকে ইংলণ্ডের রাজা হবেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মাবলম্বী।

কালপঞ্জী

টিউডর শাসকদের রাজত্বকাল	১৪৮৫—১৬০৩খ্রীঃ
স্টুয়ার্ট শাসকদের রাজত্বকাল	১৬০৩—১৬৮৮খ্রীঃ
পিটিসন অফ রাইট্‌স	১৬২৮খ্রীঃ
দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট	১৬৪০—১৬৬০খ্রীঃ
গৃহযুদ্ধ	১৬৪২—১৬৪৯খ্রীঃ
রক্তপাতহীন বা গৌরবময় বিপ্লব	১৬৮৮খ্রীঃ
অধিকারের আইন	১৬৮৯খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * ৯নম্বর

১। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের কারণগুলি কি কি?

২। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থায় অলিভার ক্রমওয়েলের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৪। গৌরবময় বিপ্লব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩নম্বর**

১। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব বলতে কি বোঝ ?

২। টীকা লেখ :— (ক) পিটিসন অফ রাইট্‌স্, (খ) লং পার্লামেণ্ট, (গ) কমনওয়েলথ, (ঘ) বিল অফ রাইট্‌স।

৩। কমন্‌ওয়েলথ শাসনের পর ইংলণ্ডে কিভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

৪। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে কি হয়েছিল ?

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১। **দু'এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) টিউডর যুগের শাসকদের মধ্যে কে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন ?

(খ) স্টুয়ার্টবংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

(গ) অলিভার ক্রমওয়েল কে ছিলেন ?

(ঘ) কার আমলে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় ?

(ঙ) ইংলণ্ডে কোন্ রাজার আমলে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ?

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—**

(ক) — খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট আহ্বান করা হয়েছিল।

(খ) ক্রমওয়েলের অশ্বারোহী বাহিনীকে বলা হত —।

(গ) — যুদ্ধে ক্রমওয়েল চার্লসকে পরাজিত করেন।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয়।

(ঙ) উইলিয়ম ছিলেন — এর অরেঞ্জ বংশের লোক।

———

অধ্যায়

ছয়

ভারতবর্ষ

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও বিস্তার ঃ

'মঙ্গোল' জাতির লোকেরা মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের অধিবাসী। চিঙ্গিস খাঁ ছিলেন মঙ্গোল জাতির এক দুর্ধর্ষ নেতা। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মঙ্গোল জাতিরই বংশধর বাবর।

বাবর (১৫২৬—১৫৩০ খ্রীঃ) ঃ বাবর ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে ফরগণার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন অধিকারের পরই তিনি রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাবুল জয় করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ইব্রাহিম লোদীর অকর্মণ্যতা ও অত্যাচারের ফলে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং আরও অন্যান্য কয়েকজন বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত করে দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ অধিকার করে নিলেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। এর ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের

বাবর



বাবর

ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু দিল্লী ও আগ্রায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতের সর্বত্র বাবরের ক্ষমতা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজপুতানার রাণা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন বীর যোদ্ধা। খানুয়া নামক স্থানে রাজপুত বাহিনীর সঙ্গে মুঘল বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল (১৫২৭ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বাবরের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজপুত বীর রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করবার পর বাবর তাঁর দ্বিতীয় শত্রু আফগান শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তিনি গোগ্‌রা নামক স্থানে আফগানদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলকে আফগান শাসন মুক্ত করেছিলেন। বাবর মাত্র চার বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা অক্ষু নদী থেকে বিহার পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ে রাজ্যে যতদূর আইন শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন সম্ভব তা তিনি করেন।

হুমায়ুন (১৫৩০—১৫৪০ খ্রীঃ এবং ১৫৫৫—১৫৫৬ খ্রীঃ) : ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল হুমায়ুনের প্রথম দায়িত্ব। কিন্তু সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকেও বিদ্রোহ ও শত্রু দমনে অগ্রসর হতে হয়। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়।



হুমায়ুন

হুমায়ুন প্রথমে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিলেন। আফগান বিদ্রোহীদের মধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ এবং বিহারের শের খাঁ ছিলেন সর্বপ্রধান। বাহাদুর শাহের শক্তি বৃদ্ধিতে হুমায়ুন ভীত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পর পর বাহাদুর শাহকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করে হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের কয়েকটি দুর্গ অধিকার করে

নিলেন। হুমায়ুন যখন গুজরাটে যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক সেই সময়ে বিহারের শের খাঁ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন শের খাঁয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু চৌসা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পারস্য দেশে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন।

শেরশাহ (১৫৪০ – ১৫৪৫ খ্রীঃ): শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে শেরশাহ নাম ধারণ করেন। বাংলাদেশে খিজির খাঁয়ের বিদ্রোহ দমন তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। অতঃপর তিনি মালব, গোয়ালিয়র রণথম্ভোর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।

শেরশাহ

শেরশাহ রাজত্ব করেছিলেন মাত্র পাঁচ বছর। কিন্তু এই সামান্য সময়ে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন তার তুলনা নেই। তার শাসনব্যবস্থার মূলকথা ছিল কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। তিনি জমি জরিপ করিয়ে প্রতিটি প্রজার জমি নির্ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে 'কবুলিয়ৎ' ও 'পাট্টার' প্রবর্তন করেন। উৎপন্ন শস্যেরএক-তৃতীয়াংশ কর হিসাবে সম্রাটকে দিতে হত। বিচারের ব্যাপারে শেরশাহ ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই সমান চোখে দেখতেন। শেরশাহের আমলে রাস্তাঘাট, গোয়েন্দা ও সামরিক বিভাগেও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত ডাক চলাচল ও দ্রুত বিলির ব্যবস্থা করেন।

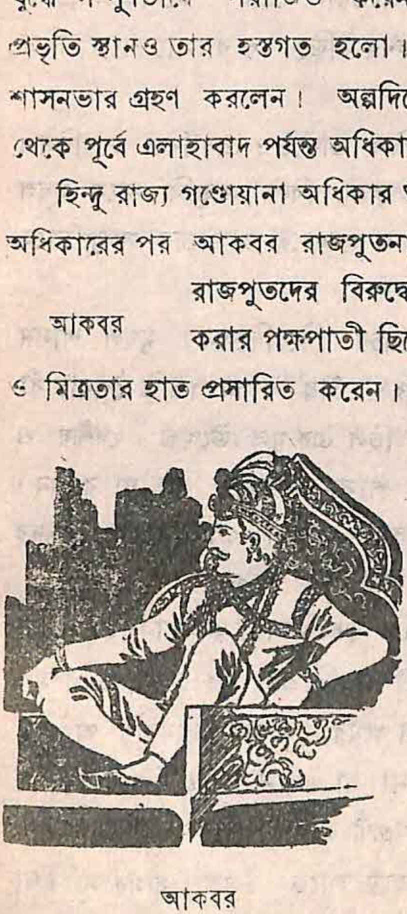
শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন মুঘল শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এর কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

আকবর (১৫৫৬—১৬০৫ খ্রীঃ): হুমায়ুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম খাঁ আকবরকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজে আকবরের অভিভাবকরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। আকবর যখন

মুঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন, সেই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লী ও পাঞ্জাব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই তখন শুরবংশীয় আফগানদের অধিকারে ছিল। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আকবর এই সকল আফগান রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র আদিল শাহের সেনাপতি হিমু আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করে নিয়েছিলেন। আকবর হিমুকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানও তার হস্তগত হলো। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আকবর পশ্চিমে মূলতান থেকে পূর্বে এলাহাবাদ পর্যন্ত অধিকার করেন।

হিন্দু রাজ্য গণ্ডোয়ানা অধিকার তাঁর অপর একটি অভিযান। গণ্ডোয়ানা অধিকারের পর আকবর রাজপুতনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু রাজপুতদের বিরুদ্ধে তিনি বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁদের প্রতি বন্ধুত্ব ও মিত্রতার হাত প্রসারিত করেন। এতে অনেক রাজপুতবীরই সাড়া দিয়েছিলেন। জয়পুরের রাজা বিহারীমল্ল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ দিয়ে মিত্রতা ও আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু মেবারের রাণা উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হননি। উদয়সিংহ মুঘল শক্তিকে বাধা দিলেন। আকবরের সঙ্গে মেবারের সৈন্য বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। আকবর চিতোর দুর্গ অধিকার করলেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)।

আকবর



আকবর

পিতার মৃত্যুর পর রাণাপ্রতাপ সিংহাসনে আরোহণ করেই চিতোর

দুর্গ পুনরায় অধিকার করে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। স্বভাবতঃই আকবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। রাণাপ্রতাপ দেশপ্রেমিক এবং বীর যোদ্ধা ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাট নামক স্থানে রাণাপ্রতাপ ও আকবরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেন না।

রাণা প্রতাপ

আকবর গুজরাট অভিমুখে যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করেছিল। আকবর উড়িষ্যা ও বাংলাদেশকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়েছিল। আহম্মদনগর, খান্দেশ, বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা, বিদর প্রভৃতি স্থানে মুঘল সেনাগণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ঐ সকল অঞ্চলের রাজাদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে।

আকবর সুশাসকরূপেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আকবর। তাঁর শাসন পদ্ধতি স্বৈরাচারী হলেও প্রজাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। দেশীয় ও বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ আকবরের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। আকবরের দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি স্থান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ রচনা করেন।

একমাত্র শেরশাহ্ ভিন্ন আকবরের মত উদার ধর্মমতাবলম্বী সম্রাট ভারতের ইতিহাসে বিরল। হিন্দুদের উপরে বিভিন্ন প্রকার কর ও বৈষম্য-মূলক আচরণ তিনি বন্ধ করেন। সকল ধর্মের মূলকথা জানবার আগ্রহে আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানা বা উপাসনা গৃহ নির্মাণ করেন। আকবর সকল ধর্মের মূলকথা প্রচারে অগ্রণী হলেন। তাঁর এই মতবাদ 'দীন-ই-ইলাহী' নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে। সকল ধর্মের মূলকথা এতে প্রকাশিত হয়েছে। আকবর শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যকার্যে বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটে। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫—১৬২৭ খ্রী:): আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। পিতা আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়েছিল। জাহাঙ্গীর বাংলার বারো ভুঁইয়াদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে ইসলাম খাঁ নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইসলাম খাঁ স্বাধীন জমিদারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করে তাদের চিরতরে দমন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে পুত্র খুর্‌রম্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সেনাপতি মাহবত খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করে পুত্র খুর্‌রম্‌কে পিতার আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পত্নীর নাম নূরজাহান। নূরজাহান জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসনকার্যে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইংরাজ বণিকদের ভারতে আগমন। স্যার টমাস-রো ইংলণ্ডের রাজার দূতরূপে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ভারতে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন। জাহাঙ্গীর সাহিত্য ও শিল্পে অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' একটি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য।

জাহাঙ্গীর

শাহজাহান (১৬২৮—১৬৫৯ খ্রীঃ): জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুর্‌রম্ বিভিন্ন যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর খুর্‌রম্‌কে 'শাহজাহান' উপাধি দিয়েছিলেন। সিংহাসন লাভের সময় থেকেই শাহজাহানকে নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পর্তুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে উপদ্রব শুরু করে। এই সকল পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে শাহজাহান কাশিম খানের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করে তাদের দমন করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে কান্দাহারে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহজাহান দক্ষিণ ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। মুঘল সৈন্য আহম্মদনগর আক্রমণ করে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নববিজিত অঞ্চলের শাসনভার

শাহজাহান

শাহজাহান তাঁর পুত্র ঔরঙ্গজেবের উপর ন্যস্ত করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে তাঁর পুত্রের মধ্যে সিংহাসনাধিকার নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। ঔরঙ্গজেব কৌশলে পিতা শাহজাহান ও ভ্রাতাদের কারাগারে বন্দী করে নিজেকে মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন [১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]। শাহজাহান বন্দী অবস্থায় আট বছর জীবিত থেকে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।


শাহজাহান

শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ বলা হয়। তাঁর আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আমলের শিল্প নিদর্শনগুলির মধ্যে তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম দেওয়ান-ই-খাস, মতি মসজিদ, জুম্মা মসজিদ ও ময়ূর সিংহাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ)ঃ ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ও পিতা শাহজাহানকে বন্দী করে সিংহাসন লাভ করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব

শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বীরত্ব, কর্মদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে ঔরঙ্গজেবই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং সংযমী সম্রাট ছিলেন। তথাপি ধর্ম বিষয়ে সংকীর্ণ তার পরিচয় দিয়ে তিনি মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারেন নি। ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সম্রাট হলেন তখন রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও গোলযোগ তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ঔরঙ্গজেব ঐ সকল বিদ্রোহ ও আক্রমণকারীদের দৃঢ়হস্তে এবং নৃশংসতার সঙ্গে দমন করেছিলেন। তিনি অকারণে হিন্দুদের বিরোধিতা শুরু করলেন। তাঁর এই ধর্মান্ধ নীতির ফলেই রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিখ, রাজপুত ও

মারাঠা জাতির মধ্যে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল। শিখদের নবমগুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরবর্তী গুরুদের অধীনে শিখজাতি এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে ঔরঙ্গজেবের বিরোধিতায় দৃঢ়সংকল্প হলেন। ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতিও নেহাত কম শক্তি প্রদর্শন করে নি। যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা রাজপুতদের দমন করা সম্ভব হয়নি।



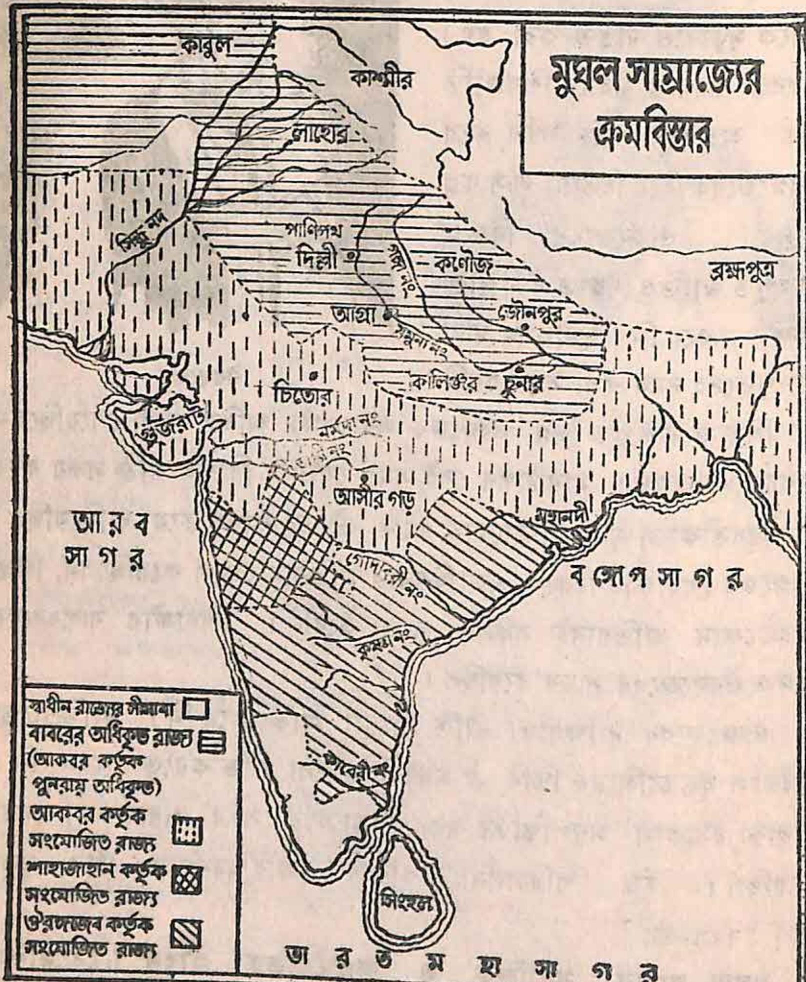
ঔরঙ্গজেব

শিখ ও রাজপুত ভিন্ন ঔরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা পেয়েছিলেন মারাঠাদের কাছে। মারাঠাগণ সেই সময় যেভাবে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে তা পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঔরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন অভিযানই সফলতা লাভ করেনি। শিবাজীর বংশধরদের সঙ্গেও ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ হয়েছিল।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সাফল্য লাভ করে নি। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়েও তিনি ঐ অঞ্চলে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ পরিচালনা কালেই আহম্মদনগরে তাঁর মৃত্যু হয় [১৭০৭ খ্রীঃ]

মুঘল যুগের সমাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন (বৈদেশিক ভ্রমনকারীর বিবরণ সহ) ঃ মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস গ্রন্থ ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়। মুঘল যুগে ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্, হকিন্স্, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভার্নিয়ে,

বার্নিয়ে, মানুচি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে মুঘল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।



সামাজিক জীবন : মুঘল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ্ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বাদশাহ্ ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরণের এবং বহু সংখ্যক।

কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে বিলাস-ব্যসন, ব্যাভিচার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাদের উপজীবিকা। তাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ। তাদের উপর সরকার থেকে অত্যধিক করভার চাপান হত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি প্রভৃতি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। মুঘল আমলে হিন্দু-অর্থ নৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। ধর্মানুষ্ঠানেও পরস্পরের সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানা প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ মুঘল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হত। কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা হত। শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সুতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের সুতীবস্ত্র, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে। আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। মুগল যুগে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মুকুব করে দিতেন। যানবাহনের অভাবহেতু খাদ্যশস্য একস্থান থেকে অন্যত্র চালান দেবার অসুবিধা হত বলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহুলোকের মৃত্যু ঘটত। মুঘল যুগে জনসাধারণের খাওয়া পরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর গড়ে উঠে-ছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা র‍্যাল্‌ফ

ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বুরহানপুর, বারাণসী, আহম্মদাবাদ, রাজমহল বর্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলে মনসেরেট নামে জনৈক ইউরোপীয় পর্যটক বর্ণনা করেছেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭—১৭৫৭ খ্রী:) : বাবর যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, তা ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮—১৭০৭) পশ্চিমে কাবুল-কান্দাহার থেকে পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্মান্ধতা ও ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতির ফল স্বরূপ বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য অবনতির পথে অগ্রসর হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই অবনতির গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। মহামতি আকবর উদার নীতির দ্বারা যে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধনীতির ফলে তারাই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। রাজপুত, জাঠ, সৎনামী, বুন্দেলা, মারাঠা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও শত্রুতা তখন মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছিল। ঔরঙ্গজেবের বংশধরগণ কেউ শাসন কার্যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। উপরন্তু তারা সর্বদাই আত্মকলহে নিজ নিজ শক্তির অপচয় করেছিলেন। তাঁদের এই দুর্বলতার সুযোগে রাজ্যের আমীর-ওমরাহগণ সর্বশক্তিমান হয়ে উঠে। রাজপরিবারের গৃহবিবাদে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পক্ষের সমর্থনে তারা এগিয়ে আসে।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা সিংহাসনের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন কিন্তু তারা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে রোধ করতে পারেন নি।

আরও অন্যান্য কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল।

প্রথমতঃ মুঘল সম্রাটগণ সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ফলে সৈন্য বাহিনীর জন্য ব্যয় বহন করতে গিয়ে উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারেন নি।

দ্বিতীয়তঃ মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র। সম্রাটের

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য লাভ করতো। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে কোন রকম কৃতিত্ব ছিল না।

তৃতীয়তঃ সাম্রাজ্যের বিশালতা এর পতনের একটি প্রধান কারণ।

চতুর্থত: আমীর-ওমরাহগণের দলাদলি ও নৈতিক অবনতি সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করেছিল।

পঞ্চমত: সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিলাসব্যসন, জাঁকজমক ও নানাবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করায় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা বিনষ্ট হয়েছিল।

ষষ্ঠত: নৌবাহিনীর অভাবও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

সপ্তমত: এরপর নাদির শাহ (১৭৩৯ খ্রীঃ) ও আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ (১৭৪৮খ্রীঃ এবং ১৭৫৬ খ্রীঃ) মুঘল সাম্রাজ্যকে একেবারে বিনষ্ট করেছিল।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন- পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা :

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে বহু ইউরোপীয় বণিক ভারতে এসেছিল। তাদের মধ্যে পর্তুগীজরাই হলো পথিকৃত। তাদের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পর্তুগীজরা এদেশে কালিকট, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দমন প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্র ব্যতীত ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশ্য পর্তুগীজদের এই পতনের জন্য তারা নিজেরাই বিশেষভাবে দায়ী ছিল। পর্তুগীজরা গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিল। তাদের ধর্মীয় অত্যাচার ও বর্বরতার ফলে ভারতবাসী মাত্রেই তাদের উপর বিরক্ত হয়েছিল।

হল্যাণ্ডের ওলন্দাজ বণিকগণ : ভারতের সাথে বাণিজ্যে পর্তুগালের সমৃদ্ধি দেখে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিও এদেশে আসতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এজন্য হল্যাণ্ডের নাবিকগণ ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অফ নেদারল্যাণ্ডস্ নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। তারা

প্রথমদিকে ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা বাণিজ্য করতেই বেশী উৎসাহী হয়। পরে তারা ভারতের মালাবার উপকূলে বাণিজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছিল। তাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় নেগাপত্তমে। ধীরে ধীরে সুরাট, কোচিন, পাটনা, বালেশ্বর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, হুগলী, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানেও তাঁরা বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজ বণিকদের বিরোধিতার সম্মুখে ওলন্দাজ বণিকগণ বেশীদিন এঁটে উঠতে পারল না।

ফরাসী বণিকগণ: ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুরাটে প্রথম একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পরের বছর মসুলিপট্টমে অপর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীগণ ভারতের পূর্ব উপকূলের পণ্ডিচেরী এবং বাংলাদেশের চন্দননগরে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে। ফরাসীদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলে ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধেছিল। এই সংঘর্ষে ফরাসী বণিক সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

ইংরাজ বণিকগণ: ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানীকে একটি সনদ দ্বারা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার দান করেছিলেন। ইংরাজগণ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে সুরাটে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে সমর্থ হন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার সুজাউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য শুরু করে এবং কাশিমবাজার, হুগলী ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে মসুলিপট্টমে ইংরাজ বণিকরা একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলে। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জবচার্ণক নামে একজন ইংরাজ কুঠিয়াল সুতানুটি গ্রামে একটি ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। এর পর ক্রমে ক্রমে কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

হস্তগত হয় এবং কলিকাতা মহানগরী গড়ে ওঠে। এইভাবে বাংলাদেশে ইংরাজ কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফারুকসিয়ার ইংরাজ কোম্পানীকে ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা দান করেছিলেন।

ডেনমার্কের বণিকগণ ঃ পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ ভিন্ন ইউরোপের ডেনমার্ক রাজ্যের বণিকদলও ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। তারা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। কিন্তু বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অপারগ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের নিকট তাদের বাণিজ্যকুঠি বিক্রয় করে ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়েছিল।

দাক্ষিনাত্যে ইংরাজ ও ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপীয় বণিকদল এদেশে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। উপরন্তু সেই সময় আবার ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলে, ভারতবর্ষেও এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটেছিল। প্রধানতঃ ভারতের দেশীয় শক্তিকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফরাসী বাণিজ্য কুঠিগুলির অধিনায়ক ডুপ্লে ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ ঃ মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী যথাক্রমে ইংরাজ এবং ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধের সূত্রে ইংরাজগণ কতকগুলি ফরাসী জাহাজ অধিকার করলে ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধ প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ (১৭৪৭-৪৮খ্রীঃ) নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ অবসানে যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল তার শর্ত অনুযায়ী ডুপ্লে ইংরাজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ ঃ ১৭৪৮ হায়দ্রাবাদের খ্রীষ্টাব্দে নিজামের মৃত্যু হলে তাঁর শূন্য পদ নিয়ে দেশীয় শক্তিগুলির মধ্যে যে উত্তরাধিকারী দ্বন্দ্ব শুরু হয়,

ডুপ্লে তাতে অংশগ্রহণ করলেন। নিজাম পদের অধিকার নিয়ে নাসির জঙ্গ মুজফ্‌ফর জঙ্গের মধ্যে বিবাদে ডুপ্লে মুজাফ্‌ফরের পক্ষ নিলেন অপরদিকে ইংরাজগণ নাসির জঙ্গের পক্ষ নিলেন। এদিকে আবার চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বয়ং নবাবী পদ দাবী করে বসলেন। এমতাবস্থায় তিনি ডুপ্লের সাহায্য চাইলে ডুপ্লে অনায়াসেই চাঁদা সাহেবকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দান করলেন। ডুপ্লে চাঁদা সাহেব ও মুজাফ্‌ফর জঙ্গের সমর্থনে অগ্রসর হলেন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ নাসির জঙ্গ এবং আনোয়ারউদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করেছিল। এইরূপে ভারতীয় রাজন্য-

ডুপ্লে



ডুপ্লে

বর্গের গৃহবিবাদে অংশগ্রহণ করে ভারতবর্ষে ইংরাজ এবং ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ইংরাজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ডুপ্লে ও চাঁদা সাহেবকে পরাজিত করেন। ডুপ্লের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বলা যেতে পারে।

তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধঃ দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারেনি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ফ্রান্স, এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে, পুনরায় ভারতবর্ষে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। এটি তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ (১৭৫৬-৬০ খ্রীঃ) নামে খ্যাত। অবশ্য এইবার দাক্ষিণাত্যের পরিবর্তে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। তথাপি দাক্ষিণাত্যে যে সংঘর্ষ হয়নি এমন নয়। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ বুসি এবং লালির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের ঘাঁটি আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁরা ইংরাজদের নিকট সম্পূর্ণভাবে

পরাজিত হলে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটল। তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসীদের পতন ঘটেছিল। এরপর ইংরাজেরা ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তারঃ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মারাঠাদের অভ্যুদয় ভারতের এক বিখ্যাত ঘটনা। পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত দাক্ষিণাত্য উপকূলকে মহারাষ্ট্র বলা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মারাঠা সাধু সন্তেরা ভক্তিধর্ম প্রচার করে তাদের প্রাণে নতুন শক্তি সঞ্চার করে। তাঁদের মধ্যে রামদাসের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। তিনি নিজে ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর প্রেরণায় মারাঠাগণ ঐক্যবদ্ধ হয়।

শিবাজীঃ এই সময় মারাঠা নায়ক শিবাজীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর অধিনায়কত্বেই বস্তুতঃ মারাঠা জাতির রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটে। তাঁর মধ্যে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্ন জেগে ওঠে। তাঁর মধ্যে মাতা জিজাবাঈ ও অভিভাবক দাদাজী কোণ্ডদেবের প্রভাব ছিল অত্যধিক। তিনি পার্বত্য মাওলিদের নিয়ে এক সৈন্যদল গড়ে তোলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে শিবাজী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তোরানা দূর্গ অধিকার করে নিলেন। তখন থেকে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর শিবাজী নিজ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি একে একে চাকন, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গ অধিকার করেন। কোঙ্কন প্রদেশও তাঁর অধিকারে আসে। মাত্র উনিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে নিজেকে দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান নেতা হিসাবে প্রমাণ করেন। বিজাপুরের সুলতান



শিবাজী

শিবাজীকে দমন করবার উদ্দেশ্যে আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিশা বাহিনীকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে আপস আলোচনা চলাকালীন শিবাজী আফজলকে 'বাঘনখ' নামক এক প্রকার অস্ত্র দ্বারা হত্যা করেছিলেন বলে কথিত আছে। ঔরঙ্গজেব মুঘল সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবাজী অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে শায়েস্তা খাঁকে আহত করেছিলেন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। জয়সিংহ শিবাজীকে মুঘল দরবারে নজরবন্দী করে রাখে। সুচতুর শিবাজী প্রহরীদের চোখে ধূলা দিয়ে বন্দীশালা থেকে পলায়ণ করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসলেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক হলো। মহীশূর ও কর্ণাটকের বিস্তৃত অঞ্চলও তাঁর শাসনাধীন ছিল। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই মারাঠা নায়কের মৃত্যু হয়।

শিবাজীর বংশধরগণ : শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। মারাঠাদের এই দুর্দিনে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র। রাজারামের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে তাঁরও মৃত্যু হয়। তখন থেকে মারারাঠাগণ দুটি পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পেশোয়াতন্ত্র : এই সময়ে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাঠা প্রধান মন্ত্রী বা পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তখন থেকে পেশোয়াই প্রকৃতপক্ষে মারাঠা রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেন। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাজীরাও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম বাজীরাও এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা রাজ্যের পেশোয়া হলেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : বালাজী বাজীরাও-এর রাজত্বকালে মারাঠা-

গণ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাব দখল করবার পর আফগান শক্তির সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। আহম্মদ শাহ আবদালী মারাঠাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে মারাঠাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। পাণিপথের যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ মিলিত হলো। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও মারাঠাগণ পরাজিত হলেন। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মারাঠাদের স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যেমন মিলিয়ে গেল তেমনি ইংরাজ বণিকদের সাফল্যের পথ সুগম হল।

শিখ জাতির উত্থান ও তাদের সংগঠনঃ শিখদের প্রথম গুরু ছিলেন গুরু নানক। চতুর্থ গুরু রামদাসের পর অর্জুন গুরু পদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি শিখদের প্রথম আদিগ্রন্থ সংকলন করেন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরটিও তিনিই নির্মাণ করেন। তিনি শিখ সম্প্রদায়কে একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টাও করেছিলেন। তাছাড়া তিনি তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁর পুত্র খসরু সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলে শিখগুরু অর্জুন তাঁকে সাহায্য করেন। এতে রুষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে বন্দী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তেগবাহাদুর ছিলেন শিখদের নবম গুরু। তিনি ঔরঙ্গজেবের হিন্দু বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এর ফলে তিনি ঔরঙ্গজেবের বিরাগ ভাজন হন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান এবং দিল্লীতে পৌঁছাবার পর ঔরঙ্গজেব তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু তেগ বাহাদুর দৃঢ়তার সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তাঁর নিকট প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম ছিল বড়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন তেগবাহাদুরের আত্মদান সমস্ত শিখ জাতিকে এক নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করল।

তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর মাত্র পনের বছর বয়সে গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন শিখজাতির দশম ও শেষ গুরু। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক তাঁর পিতার নির্মম হত্যা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তিনি এর প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কুড়ি বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তুতি চলে। তিনিই শিখজাতিকে একটি সম্পূর্ণ সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। তিনি ব্যক্তিগত গুরুপদ রহিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, খালসা সংস্থাই হল শিখদের গুরু। 'খালসা' শব্দের অর্থ হল পবিত্র। তিনি ঘোষণা করেন যে, খালসায় বর্ণ, জাতি ও উচ্চনীচের কোন ভেদ থাকবে না। নব দীক্ষিত প্রত্যেক শিখের উপাধি হবে 'সিং'। 'ক' আদ্যক্ষরের পাঁচটি জিনিষ—কেশ (লম্বা চুল), কঙ্কা (চিরুনী), কচ্ছা (জাঙ্গিয়া,) কৃপাণ (তরবারী) ও কড়া (লোহার বালা) তাদের ধারণ করতে হবে। তিনি খালসা সংগঠন করে শিখ জাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। এইভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ এক বীরদৃপ্ত ও স্বাধীনতাকামী জাতি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বান্দা বাহাদুর নামে এক রাজপুত শিখ জাতির নেতৃত্ব গ্রহন করেন। বান্দা মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখদের সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে শিখেরা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠেলি।

কালপঞ্জী

বাবর	১৫২৬—১৫৩০ খ্রীঃ,
	পাণিপথের ১ম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্রীঃ
হুমায়ুন	১৫৩০—১৫৪০ খ্রীঃ,
	১৫৫৫—১৫৫৬ খ্রীঃ
শেরশাহ	১৫৪০—১৫৪৫ খ্রীঃ
আকবর	১৫৫৬—১৬০৫ খ্রীঃ,
	পাণিপথের ২য় যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রীঃ

জাহাঙ্গীর	১৬০৫—১৬২৭ খ্রীঃ
শাহজাহান	১৬২৮—১৬৫৯ খ্রীঃ
ঔরঙ্গজেব	১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ
কর্ণাটের ১ম যুদ্ধ	১৭৪৬—১৭৪৮ খ্রীঃ
কর্ণাটের ২য় যুদ্ধ	১৭৪৯—১৭৫৪ খ্রীঃ
কর্ণাটের ৩য় যুদ্ধ	১৭৫৬—১৭৬৩ খ্রীঃ
শিবাজীর জন্ম	১৬২৭ বা ১৬৩০ খ্রীঃ
বালাজী বিশ্বনাথ	১৭১৪—১৭২০ খ্রীঃ
প্রথম বাজীরাও	১৭২০—১৭৪০ খ্রীঃ
বালাজী বাজীরাও	১৭৪০—১৭৬১ খ্রীঃ
পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ	১৭৬১ খ্রীঃ
গুরু গোবিন্দ সিংহ	১৬৭৫—১৭০৮ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন — ১০নম্বর

১। বাবর কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

২। শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন ?

৪। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

৫। শাহজাহানের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান ?

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেব কতখানি দায়ী ?

৭। মুঘল যুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৮। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৯। ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের দ্বন্দ্বের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১০। শিবাজীর নেতৃত্বে কিভাবে মারাঠাশক্তির উত্থান হয়েছিল আলোচনা কর।

১১। শিখ জাতির উত্থান ও তাদের সংগঠন সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩ নম্বর**

১। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?
২। রাণা প্রতাপ সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। নূরজাহান কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?
৪। মুঘল যুগের কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের নাম উল্লেখ কর। তাঁরা মুঘল যুগ সম্বন্ধে কি বলে গেছেন?
৫। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?
৬। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৭। শিখ শক্তির সংগঠনে গুরু গোবিন্দ সিংহের অবদান বর্ণনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * * * * * **১ নম্বর**

(ক) ১। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
২। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল?
৩। হলদিঘাটের যুদ্ধ কবে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল?
৪। দীন ইলাহী কে প্রবর্ত্তন করেন?
৫। তাজমহল কে নির্মাণ করেছিলেন?
৬। মানুচী কোন্ মুঘল সম্রাটের আমলে ভারতে আসেন?
৭। ডুপ্লে কে ছিলেন?
৮। বন্দীবাসের যুদ্ধে কারা জয়লাভ করেছিলেন?
৯। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে হয়েছিল?
১০। প্রথম পেশোয়া কে ছিলেন?
১১। শিখদের দশম গুরু কে ছিলেন?

(খ) ১। বাঁদিকে কতকগুলি সাল এবং ডানদিকে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া আছে। সাজিয়ে লেখ।

(ক) ১৫২৭ খ্রীঃ	(ক) জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ
(খ) ১৫৫৬ খ্রীঃ	(খ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু
(গ) ১৬০৫ খ্রীঃ	(গ) বন্দীবাসের যুদ্ধ
(ঘ) ১৭০৭ খ্রীঃ	(ঘ) খানুয়ার যুদ্ধ
(ঙ) ১৭৬০ খ্রীঃ	(ঙ) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

অধ্যায়

সাত

ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার
(১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত)

(ক) **প্রথম স্তর ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ঃ** দাক্ষিণাত্যে শক্তিলাভ করলেও ইংরাজদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন প্রথম সম্ভব হয় বাংলাদেশে। অথচ প্রথম থেকেই বাংলাদেশের শাসকবর্গ তাদের সুনজরে দেখেননি। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ইংরাজেরা বাংলাদেশে মাথা তুলতে পারেনি। আলিবর্দ্দীর আমলেও নবাবের আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা ইংরাজ বা ফরাসী কারো ছিল না।

সিরাজ-উদ্-দৌলা ঃ আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার নবাব পদে আসীন হন। সিরাজ নির্বিবাদে সিংহাসনে বসলেও তাঁর আত্মীয়েরা গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। এই সময়ে নানা কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। সেনাপতি মীরজাফরও তখন বাংলার সিংহাসন দখল করবার জন্য আগ্রহী হয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। তখন ইংরাজগণও তাতে অংশগ্রহণ করল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত করে সিরাজকে পদচ্যুত করার চেষ্টা চালালেন।



সিরাজ-উদ্-দৌলা

পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ) ঃ কয়েকদিনের মধ্যেই সামান্য অজুহাতে

ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পলাশীর প্রান্তরে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হল। নবাবের বাহিনীতে ছিল ৫০ হাজার সৈন্য; ক্লাইভের অনুচর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২০০। তথাপি মীরজাফরের চক্রান্তে হতভাগ্য নবাব যুদ্ধে পরাজিত হলেন। ভারতের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী হলেন মীরজাফর নয়—ইংরাজেরা। বাংলাদেশকে ঘাঁটি করে ইংরাজেরা দিকে দিকে তাদের বিজয় অভিযান শুরু করে।

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ)ঃ ইংরাজদের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুসারে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসালেন। মীরজাফর ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক দাবী মিটাতে সক্ষম হননি। এমতাবস্থায় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তার জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠা করল।

মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ)ঃ কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে মীরকাশিমের বন্ধুত্ব বেশীদিন স্থায়ী হল না। শাসনকার্যের সকল ব্যাপারে ইংরাজদের প্রভু-সুলভ কর্তৃত্ব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মীরকাশিম কোম্পানীর অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিলেন। মীরকাশিমের কার্য-কলাপের ফলে তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের মনোমালিন্য হয় এবং বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজয়ের ফলে কেবলমাত্র বাংলাই নয় সমগ্র পূর্ব- ভারতে ইংরাজদের আধিপত্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্লাইভের প্রতিষ্ঠাঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানীর দেওয়ানী লাভঃ মীরকাশিমের পতনের পর অল্পদিনের জন্য মীরজাফরকেই পুনরায় বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে ইংরাজ কোম্পানী মীরজাফরের বালক পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনে বসায়।

শেষ পর্যন্ত কোম্পানী দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) লাভ করে এবং সেই সঙ্গে বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন থেকে সুরু করে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব একমাত্র ক্লাইভেরই প্রাপ্য। তাঁকেই ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। এরপর তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীঃ) : ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন ভারতবর্ষে আসেন, সেই সময় ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের ফলে দেশের



ক্লাইভ



ওয়ারেন হেষ্টিংস

সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে ইংরাজ শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হেষ্টিংসের অবদান কম নয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় থেকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে।

মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ (১৭৭৫-১৭৮২) : এই সময় ভারতে দুই প্রধান শক্তি—মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যকে দমন করা ছিল হেষ্টিংসের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের

মধ্যে পেশোয়া পদটি নিয়ে গৃহবিবাদ সুরু হলে, এই অবস্থায় ইংরাজদের অংশ গ্রহণ করবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হলেন। কিন্তু এতে তাঁর খুল্লতাত রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য বিদ্রোহ শুরু করলেন। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর পেশোয়া পদ দীর্ঘস্থায়ী হল না। নানা ফড়্নবীশ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন এবং রঘুনাথ রাওকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। রঘুনাথ রাও মারাঠা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজদের শরণাপন্ন হন। এইভাবে ইংরাজরাও এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবাই-এর চুক্তি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজগণ নারায়ণ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া বলে স্বীকার করে নিল। রঘুনাথ রাওকে বার্ষিক কিছু টাকা ভাতা হিসাবে দেবার ব্যবস্থাও করা হল। ইংরাজগণ সলসেট নিজ অধিকারভুক্ত করতে সমর্থ হয়।

হায়দর আলি (১৭৬১-১৭৮২): অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হায়দর আলীর নেতৃত্বে মহীশূরের অভ্যুত্থান ইংরাজদের রাজ্য বিস্তারে এক নিদারুণ বাধার সৃষ্টি করে। প্রথম জীবনে হায়দর ছিলেন এক সামান্য সৈনিক। ক্রমে মহীশূর রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) ইংরাজেরা হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধেও (১৭৮০-৮৪ খ্রীঃ) ইংরাজগণ প্রথম দিকে সুবিধা করে উঠতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত হায়দর ইংরাজদের নিকট পরাজিত হন।

টিপু সুলতান: হায়দর আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান মহীশূর রাজ্যের সুলতান হলেন। হায়দর আলী ইংরাজদের বিরুদ্ধে

যে যুদ্ধ শুরু করেন, তা টিপু সুলতান পিতার মৃত্যুর পর যথেষ্ট সাফল্যের সংগে চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির ফলে দ্বিতীয়



হায়দর আলি



টিপু সুলতান

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধি দাক্ষিণাত্যে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ করলেও যথার্থ শান্তি আনতে পারেনি।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ): ১৭৮৬ খ্রীঃ ভারতে গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। শাসনভার পেয়েই কর্ণওয়ালিস বুঝলেন টিপুকে বেশি সময় দেওয়া অনুচিত। ১৭৯০ খ্রীঃ তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। টিপু বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ১৭৯২ সালে ইংরাজশক্তি মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে টিপুকে আক্রমণ করল। তারা টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গমপত্তম্ অবরোধ করে বসল। টিপু নিজ রাজ্যের অর্ধাংশ বিজয়ী পক্ষকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধির ফলে দিন্দিগুল, বড়মহল, কুর্গ ও মালাবার অঞ্চল চলে গেল ইংরাজদের হাতে।

লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ): মারাঠা শক্তিকে দমন করতে গিয়ে ওয়েলেসলীকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং

এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। তাছাড়া মহীশূর রাজ্যের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ তখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তাঁর আমলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে টিপু সুলতান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও নিহত হলে মহীশূর রাজ্য ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।



লর্ড ওয়েলেসলী

লর্ড ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি হিসাবে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নীতি অনুসরণের ফলেই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওয়েলেসলীর 'অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি'র মূলকথা ছিল এই যে, যে সকল দেশীয় রাজ্য ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হবে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ইংরাজ সরকার গ্রহণ করবে। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতিকে স্বীকার করে নিজ রাজ্যের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন। 'বেসিনের চুক্তির' দ্বারা দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজদের অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে যুগ্মভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এইভাবে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের সূচনা হল (১৮০৩-১৮০৫ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁরা সাফল্যলাভ করতে পরেননি।

লর্ড হেষ্টিংস: তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮ খ্রীঃ): দ্বিতীয় বাজীরাও অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের পর মনে মনে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে

চাইলেন। ইংরাজগণ এইবার পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ) এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। যুদ্ধে পেশোয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। পেশোয়ার রাজ্যকে বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। পেশোয়ার পর ভোঁসলের রাজ্যকেও বৃটিশের কুক্ষিগত করা হয়। হোলকার বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ইংরাজদের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন। এইরূপে শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের পদানত হয়েছিল।

(খ) বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তীস্তর (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) : লর্ড হেষ্টিংসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় কোম্পানীর সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে শতদ্রু এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না।

লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে রাজ্যবিস্তার (১৮২৩-১৮২৮ খ্রীঃ) ঃ লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খ্রীঃ) শুরু হল। ইয়ান্দাবুর সন্ধি (১৮২৬ খ্রীঃ) অনুযায়ী ব্রহ্মরাজ কাছাড়, মনিপুর, জয়ন্তিয়া ও অহোমরাজ্যের উপর সকল দাবী পরিত্যাগ করলেন ; আরাকান এবং টেনাসেরিম প্রদেশ দুটি কোম্পানীকে প্রদান করলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের আমলে রাজ্যবিস্তার (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ) : কাছাড়ের রাজা যখন কোন উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন বেণ্টিংক প্রজাদের অনুরোধে কাছাড়কে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কুর্গ এবং জয়ন্তিয়া রাজ্যও বেণ্টিংক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মহীশূরের শাসনকার্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে বেণ্টিংক ইংরাজ কর্মচারীর হস্তে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করেন।

পরবর্তী গভর্ণর—জেনারেলগণের আমলে রাজ্যবিস্তার ঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ে (১৮৩৬-৪২ খ্রীঃ) ইংরাজরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কুর্ণুল অধিকার করে। তিনি আফগানিস্থানের উপর বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

লর্ড এলেনবরার আমলে (১৮৪২-৪৪ খ্রীঃ) প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটে। সিন্ধুদেশ বিজয় লর্ড এলেনবরার একটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁর আমলে গোয়ালিয়র রাজ্য ইংরাজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের বিরোধ : ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তি যখন দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার করছিল সেই সময়ে শিখ দলনেতারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ফলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে নি। এমন সময় রণজিৎ সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি শিখদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন।

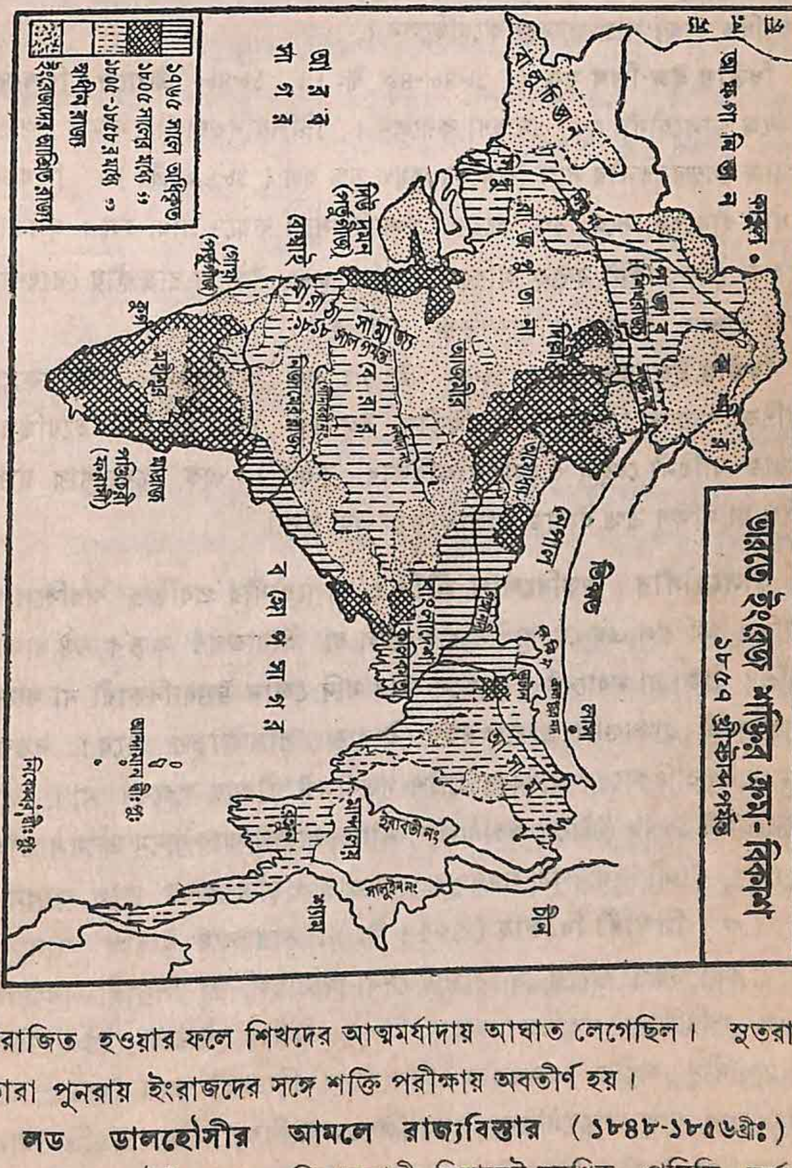
রণজিৎ সিংহ : রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন সুকেরচকিয়া মিস্‌লের নায়ক। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র তেরো বছর বয়সে একটি মিস্‌লের দলপতি হন। প্রথমেই রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর তীরবর্তী শিখ মিস্‌লগুলি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গভর্ণর জেনারেল চার্লস মেটাকাফের রাজত্বকালে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সন্ধির শর্ত অনুসারে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর দক্ষিণতীরের রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনীকে দমন করবার উদ্দেশ্যে রাজমাতা ঝিন্দন এক অভিনব পন্থা অনুসরণ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্য দমনের উদ্দেশ্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করতে লাগলেন। ইংরাজগণ স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হয়ে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই



রণজিৎ সিংহ

সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীঃ)।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬ খ্রীঃ) ঃ প্রথম শিখযুদ্ধে শিখগণ



পরাজিত হওয়ার ফলে শিখদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। সুতরাং তারা পুনরায় ইংরাজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

লর্ড ডালহৌসীর আমলে রাজ্যবিস্তার (১৮৪৮-১৮৫৬খ্রীঃ) ঃ লর্ড ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন

করেছেন। যুদ্ধের দ্বারা এবং স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে তিনি একাধিক রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে ডালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শিখদের তুমুল যুদ্ধ হল (১৮৪৯ খ্রীঃ)। শিখগণ অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। মুলতান ইংরাজ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা পাঞ্জাব ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খ্রীঃ) ঃ লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইংরাজ বাহিনী রেঙ্গুন ও বেসিন অধিকার করল। এক ঘোষণার দ্বারা পেগু বা দক্ষিণ ব্রহ্ম ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হল।

ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ঃ ডালহৌসীর প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতির অর্থ হল এই যে, অধীন রাজ্যগুলি বা ইংরাজগণ কর্তৃক সৃষ্ট রাজ্যগুলির রাজা বা নবাবের মৃত্যু হলে তাঁর যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে ঐ রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। দত্তক-পুত্রের উত্তরাধিকারের অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্বীকার করবেন না। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ক্রমে ক্রমে সাঁতারা নাগপুর, ঝাঁন্সী, যোধপুর, সম্বলপুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য দখল করেন।

(গ) **সিপাহী বিদ্রোহ** (১৮৫৭ খ্রীঃ) ঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথমে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন কারণে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ভারতীয় সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানা কারণ ছিল। কিন্তু সিপাহীদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের প্রকাশ প্রথম ঘটে বলে একে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়।

কারণ : প্রথমতঃ, ডালহৌসী অনুসৃত স্বত্বলোপ নীতি সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে ডালহৌসী সাঁতারা, নাগপুর, সম্বলপুর, ঝাঁন্সী, উদয়পুর, করৌলি প্রভৃতি রাজ্য দখল করলেন। অপ্রয়োজনীয় বলে অবজ্ঞা করে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার সম্মানজনক উপাধি লোপ করা হল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হল। এই ঘটনাগুলি সারা ভারতের অভিজাত, অনভিজাত সকল মানুষকেই অসন্তুষ্ট করে তুলল।

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভারতবাসী সেই সময়ে বিদেশীয়দের হস্তে ধর্ম হারাবার ভয়ে ভীত ছিল। তাছাড়া সতীদাহ প্রথা বিলোপ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন প্রভৃতিও সনাতন দেশবাসীর মনে আঘাত করেছিল।

তৃতীয়তঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। বৃটিশ অধিকৃত বহু দেশীয় রাজ্যে রাজকর্মচারীরা চাকুরী হারিয়ে অর্থনৈতিক দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়েছিল।

চতুর্থতঃ, সামরিক বাহিনীর অসন্তোষ সিপাহী বিদ্রোহকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। ইংরাজ সিপাহীদের তুলনায় দেশীয় সিপাহীদের বেতন ছিল অনেক কম। সিপাহীদের মধ্যে এই বেতনের তারতম্য দেশীয় সিপাহীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। দেশীয় সিপাহীদের সামরিক বাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হতো না। ফলে তাদের উন্নতির পথ ছিল সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ। ইংরাজগণ নিজ স্বার্থে দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজন বোধে দূরবর্তী দেশেও প্রেরণ করত।

এইসব পরোক্ষ কারণে দেশব্যাপী মানুষ এবং ভারতীয় সিপাহীরাও যখন বিক্ষুব্ধ তখন এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করল এনফিল্ড রাইফেল নামক এক প্রকার বন্দুকের প্রচলনের চেষ্টা! এই নতুন ধরণের বন্দুকের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। হঠাৎ রটে গেল যে,

এই টোটায় গরু ও শুকরের চর্বি মিশানো আছে। স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এই সন্দেহ জাগল যে, তাদের ধর্মচ্যুত করে খ্রীষ্টান করবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ টোটার প্রচলন করা হয়েছে। এই সমস্ত নানা কারণে ভারতীয় সৈন্যদলের বিদ্রোহ দেখা দিল।

প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটল বাংলার ব্যারাকপুরে। মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরাজরা তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। তিনিই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ। এই বিদ্রোহ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল উত্তর ভারতের মীরাট, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, রোহিলখণ্ড, মধ্য-প্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে। কানপুরের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব এবং তাঁর প্রধান সহযোগী তাঁতিয়াতোপী। মধ্য-ভারতের ঝাঁন্সীর বিধবা রাণী লক্ষীবাঈও ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

প্রকৃতি : ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ভারতীয়দের মতে এটা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। আবার কেউ কেউ এটাকে শুধুমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহই বলে থাকেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এই বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। সার্ভারকর প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর '১৮৫৭' গ্রন্থে বলেছেন, "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহরূপে আরম্ভ হলেও এটা সকল স্থানে সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে এটা জন সমর্থন লাভ করেছিল। তবে এই বিদ্রোহকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা সঙ্গত"।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ : সিপাহী বিদ্রোহের বিফলতার কারণ প্রসঙ্গে, প্রথমতঃ বলা যেতে পারে যে বিদ্রোহীগণ কোন প্রকার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। বিদ্রোহের নেতৃবর্গ ব্যক্তিগত প্রাধান্য এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুঘল বাদশাহ যেমন

পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। তেমনি নানাসাহেব মধ্যপ্রদেশ এবং যুক্তপ্রদেশে তাঁর প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সিপাহী বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের কর্মপন্থার কোন যোগাযোগ বা সংহতি ছিল না, বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে স্থানীয় নেতারা বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এর পরিণাম স্বরূপ একই সঙ্গে সর্বত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়তঃ, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার অপর একটি কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহে জনসাধারণকে সামিল করবার কোন চেষ্টাও নেতৃবর্গ করেননি। সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, দেশীয় সিপাহী-দের প্রাচীন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র তাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। ইংরাজগণ উন্নত ধরণের অস্ত্র নিয়ে অতি সহজেই বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করতে সমর্থ হয়।

(ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল : (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ) :

ইংরাজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজদণ্ড অধিকার করে নেয়।) ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অস্তমিত হয়। এরপর থেকে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। পরাধীনতার অভিশাপ ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনে ভারতীয়গণতো বটেই, এমনকি বিলাতের ইংরাজগণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কোম্পানীর অপশাসনের ফলেই বাংলায় দেখা দিয়েছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ইংরাজদের বৈষম্যমূলক নীতিও ভারতবাসীকে ব্যথিত করেছিল। দায়িত্বপূর্ণ পদে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হত। ফলে ভারতীয়গণ বঞ্চিত হত। এই জন্যই শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ভারতবাসীর সদ্ভাব গড়ে উঠতে পারেনি।

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক শোষণ চলতে থাকে। ইংরাজ বণিকগণ ভারতে অবাধ

বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে দেশীয় বণিকদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ মানচেষ্টার থেকে কলে উৎপন্ন সূতীবস্ত্র বাংলায় আমদানী হতে লাগল। এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পেরে বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। এইভাবে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

কালপঞ্জী

পলাশীর যুদ্ধ	১৭৫৭ খ্রীঃ
বক্সারের যুদ্ধ	১৭৬৪ খ্রীঃ
ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ	১৭৬৫ খ্রীঃ
প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ	১৭৭৫-১৭৮২ খ্রীঃ
প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	১৭৮০-১৭৮৪ খ্রীঃ
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	১৭৯০-১৭৯২ খ্রীঃ
প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ	১৮২৪-১৮২৬ খ্রীঃ
রণজিৎ সিংহ	১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ
চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	১৭৯৯ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ	১৮০৩-১৮০৫ খ্রীঃ
তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ	১৮১৭-১৮১৮ খ্রীঃ
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ	১৮৪৫-১৮৪৬ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ	১৮৪৮-১৮৪৯ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ	১৮৫২ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ **৯নম্বর**

১। বাংলায় ইংরাজদের প্রভুত্ব স্থাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাজদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

৩। 'অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি' বলতে কি বোঝ? এই নীতি দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কতদূর বিস্তার ঘটেছিল?

৪। মারাঠারা কিভাবে ইংরাজদের বিরোধিতা করেছিল তা বর্ণনা কর।

৫। ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের বিরোধের একটি বিবরণ দাও।

৬। 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি' বলতে কি বোঝ? এই নীতি দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল?

৭। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৮। ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ **৩নম্বর**

১। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

২। বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৩। ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ সম্বন্ধে কি জান?

৪। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ গুলি উল্লেখ কর।

মৌখিক প্রশ্ন ✱ ✱ ✱ **এক নম্বর**

(ক) পলাশীর যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল?

(খ) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?

(গ) 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' কে প্রবর্তন করেন?

(ঘ) 'স্বত্ববিলোপ নীতি' কার আমলে প্রবর্তিত হয়?

(ঙ) হায়দর আলি কে ছিলেন?

(চ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কার কার মধ্যে হয়েছিল?

(ছ) সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল?

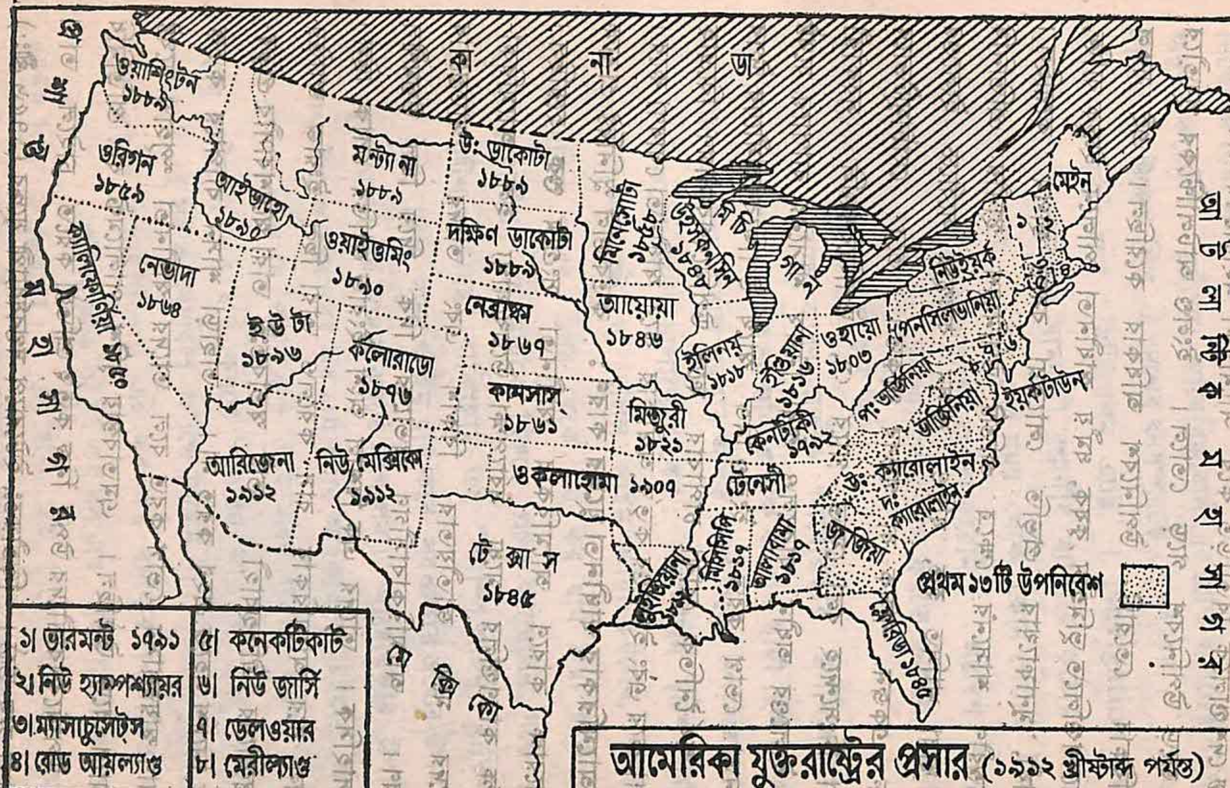
অধ্যায়

আট

অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ (যুক্তিবাদের যুগ)

ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীকে বলা হয় 'যুক্তিবাদের যুগ'। এই যুগের মানুষ পূর্বেকার অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সব জিনিসকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে, বিশেষ করে ফরাসী দেশে বহু চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। এই যুগের দার্শনিকগণ প্রচার করেন—প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয়, তবে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাও নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এই যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা গণতন্ত্র, ন্যায়-বিচার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজারা বলতেন—রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধ্বনিত হল—রাজা জনগণের প্রতিনিধি, কেননা জনসাধারণই হল রাষ্ট্রের উৎস। এই যুগের অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও অবাধ বাণিজ্যের দাবী জানান। এই যুগেই শোনা গেল—জনগণের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোন পার্লামেণ্ট কর ধার্য করতে পারে না। এইসব মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের পথ রচনা করে।

(ক) **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ :** সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তর আমেরিকায় হল্যাণ্ড, স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই সকল উপনিবেশগুলি শাসন করতেন ইংরাজ সরকার মনোনীত গভর্ণরেরা। ক্রমে ইউরোপীয় দেশসমূহ উপনিবেশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রসার (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

অন্যান্য দেশগুলিকে বিতাড়িত করে আমেরিকা মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইংলণ্ড আটলান্টিকের পূর্বতীরে আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশ অধিকার করেছিল। এই সকল উপনিবেশগুলিতে ভূমিহীন কৃষক, ধর্মীয় স্বাধীনতা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর প্রভৃতি লোকেরা বসতি স্থাপন করেছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপনিবেশ স্থানীয় প্রতিনিধি সভার দ্বারা শাসিত হত, যদিও শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ইংলণ্ডের নিযুক্ত একজন শাসক বা গর্ভণর থাকত। তবে মোটামুটিভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, উপনিবেশগুলি সরকারী ভাবে ইংলণ্ডের অধীন থাকলেও তাঁরা নিজস্ব শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। ইংলণ্ড নিজ স্বার্থে উপনিবেশবাসীদের উপর ক্রমে অর্থ নৈতিক বোঝা চাপাবার ফলে উপনিবেশবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণ : কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। পরোক্ষ কারণগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকা-বাসীদের মনে জাতীয়তার বিকাশ এবং তাদের স্বাতন্ত্রবোধ জাগরণ। আমেরিকাবাসীগণ স্বভাবের দিক দিয়ে ছিল উদ্যমশীল ও দুঃসাহসিক। তাদের এক বিশাল অংশ ইংরাজ জাতির লোক ছিল। বহুকাল ধরে আমেরিকায় বাস করলেও তারা ছিল ইংরাজ জাতির স্বাতন্ত্রবোধের ঐতিহ্যবাহী। তাই স্বভাবতঃই তারা স্বদেশবাসীর প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক নির্দেশ সহজে গ্রহণ করত না। তাছাড়া শাসন ব্যাপারে কতক পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত বলে তাদের স্বাধীনতা স্পৃহাও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় বৃটিশ পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধি সভা উপনিবেশবাসীদের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬ খ্রীঃ) ফলে কানাডা থেকে ফ্রান্স বিতাড়িত হওয়ার আগে আমেরিকাবাসীগণ

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তৃতীয়তঃ, আমেরিকাবাসীদের প্রতি ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ দেশের ধনসম্পদকে শোষণ করা। ১৬৬০ খ্রীঃ বৃটিশ প্রতিনিধি সভা 'নেভিগেশন এ্যাক্ট,' (**Navigation Act**) প্রণয়ন করে আমেরিকার আমদানী, রপ্তানীর ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় থেকে কোন ক্ষেত্রেই ইংলণ্ড ঐ আইনগুলি কঠোর ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড অকস্মাৎ ঐ আইন গুলি দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে চাইলে, স্বভাবতঃই উপনিবেশবাসীগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

উপরোক্ত পরোক্ষ কারণ ব্যতীত আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণও স্থায়ী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ সরকার অধিক চাপে পড়ে উপনিবেশবাসীদের উপর নতুন করের বোঝা চাপাতে থাকেন। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্রেনবিল 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' বা দলিল আইন জারী করলেন, অর্থাৎ সর্ব প্রকার দলিল পত্রের উপর থেকে এই কর ধার্য করা হতে লাগল। আমেরিকাবাসীগণ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলল। পরবর্তী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাকিংহাম এই "স্ট্যাম্প আইন" বাতিল করে দিলেন বটে, কিন্তু নতুন আইন ধার্য করে সর্বপ্রকার দ্রব্যের উপর থেকে এক নতুন ধরণের কর আদায় করতে লাগলেন। আমেরিকার উপনিবেশবাসীগণ ইংরেজ সরকারের কর ধার্য করার অধিকারকে এইবার অস্বীকার করে ঘোষণা করল যে, পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত বৃটিশ পার্লামেণ্ট কোন আইন বা কর ধার্য করতে পারবেন না। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের অনেকেই এই সব কর বসাবার স্বপক্ষে ছিলেন না। চ্যাথাম্ পিট, এডমণ্ড বার্ক প্রভৃতি রাজনীতিকেরা এই সব কর বসাবার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে ঐ সব কর বসাবার অধিকার বা আবশ্যকতাই

এডমণ্ড বার্ক

ছিল না। একদিকে এই বিরোধিতা এবং অন্যদিকে আমেরিকাবাসীদের তীব্র আন্দোলনের ফলে ইংরাজ শাসকগণ এই নতুন

আইন বাতিল করলেন। ছয়টি দ্রব্যের মধ্যে পাঁচটি দ্রব্যের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হল। তবে চায়ের উপর থেকে তাঁরা কর তুললেন না। এই কর না তুলে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যেন প্রমাণ করতে চাইলেন যে তাঁদের কর বসাবার অধিকার আছে।

চা-এর কর ধার্য করবার প্রতিবাদে বোষ্টন বন্দরে এক উত্তেজিত জনতা এক জাহাজ থেকে চা-এর বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলে দিল। আমেরিকাবাসীদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার দমননীতি প্রয়োগ করলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হল। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তীব্র অত্যাচার তাদের একজোট হতে সাহায্য করল।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সকল উপনিবেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া শহরে এক কংগ্রেস বা মহাসভায় যোগদান করল। ১৭৭৬ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করল।

এই ঘোষণা ইংরাজেরা সহজভাবে মেনে নিল না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই সংগ্রামে ঔপনিবেশিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। ১৭৭৭ খ্রীঃ লেক্সিটন এবং বাঙ্কার্সহিলের যুদ্ধে ইংরাজ শক্তির পরাজয় হল। অবশেষে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সামরিক প্রধান কর্ণওয়ালিস পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পন করলেন। ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা ইংরাজপক্ষ আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নিল।


জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকার সাফল্যের কারণ : প্রথমতঃ রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের জনমতের একটি বড় অংশ আমেরিকার

ঔপনিবেশিক গণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল। এর ফলে ইংরাজ সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের বৈদেশিক দপ্তর এই যুদ্ধে চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় দেয়। ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েনের অলসতা ও দূরদর্শিতার অভাব এবং ইংলণ্ডের সমর দপ্তরের অকর্মন্যতা ইংলণ্ডের পরাজয় ডেকে আনে।

তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্ব ইংলণ্ডের সমর প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দেয়। আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে সেনা ও রসদ পত্রের সরবরাহ বজায় রাখা ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ ছিল না।

চতুর্থতঃ, ফরাসী নৌ-সেনাপতি ডি গ্রাস নৌবহর নিয়ে আমেরিকার পক্ষে যোগ দিলে আমেরিকার জয় সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ, আমেরিকান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ও রণ-কুশলতা আমেরিকার সাফল্যের সোপান রচনা করে। ওয়াশিংটন আমেরিকার যুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করেন।

ফলাফল: আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল সুদূর প্রসারী ছিল। স্বাধীনতা লাভ করবার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ক্ষমতা লাভ করে। অল্পকালের মধ্যে আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার এই উন্নতি স্বাধীনতা লাভের ফলেই সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এক নবীন রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ স্থাপিত হয়।

তৃতীয়তঃ, আমেরিকার বিপ্লব ইংলণ্ডের ইতিহাসে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে রাজা তৃতীয় জর্জের জন্যই ইংলণ্ডে আমেরিকার পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং হুইগ দল ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপ বন্ধ করে। হুইগ দল ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকারের দাবী মেনে নেয়। আমেরিকার যুদ্ধে হেরে ইংরাজ সরকার তাদের পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয়। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে। ভারতবর্ষে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা দেখবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি "নিয়ন্ত্রণ পরিষদ" স্থাপন করে।

চতুর্থতঃ, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই আমেরিকার যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয় করে তার রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। অর্থাভাববশতঃ তিনি জাতীয় সভা বা স্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। এর ফলে ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়।

পঞ্চমতঃ, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র পুরাতন তন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে বহু স্বাধীনচেতা লোক আমেরিকার স্বাধীনতার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তথায় বসবাস করতে যান। ইটালীতে আমেরিকার অনুকরণে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়।

(খ) ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব :

শিল্প বিপ্লবের অর্থ : শিল্প বিপ্লব ইংলণ্ডে প্রথম শুরু হয়েছিল। কতকগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সম্ভবপর হয়েছিল। শিল্প-বিপ্লব বলতে মোটামুটিভাবে শিল্পোন্নতির আমূল পরিবর্তনকে বোঝায়। এই বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

কৃষি বিপ্লব : শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই কাঁচামাল অধিক মাত্রায় উৎপন্ন না হলে কারখানার যোগান দেওয়াও সম্ভব হবে না। ফলে কৃষিক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরণের তরিতরকারী প্রভৃতি তৈরী হতে থাকে। কৃষির উন্নয়নের জন্য সেই সময় নানা ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হতে থাকে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, একই জমিতে দু-বছরের বেশী শস্য উৎপাদন করলে জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং জমির এক তৃতীয়াংশ প্রতি বছর অনাবাদী থাকত। লর্ড টাউনসেণ্ড নামক একজন ইংরাজ জমিদার প্রত্যেকটি জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শস্য রোপন করে উপরোক্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। কৃষিকার্যের

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশুরও যথেষ্ট উন্নতি হতে লাগল। এইভাবে ইংলণ্ডে প্রথম কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়।

শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ : সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে ভূমি দান প্রথার বিলোপ সাধন ঘটেছিল তাতে ঐ দেশের শ্রমিকগণ স্বাধীনভাবে কল-কারখানায় কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড সেই সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স পরাজিত হয়ে ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। অপরদিকে ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্বত্র নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করে একটি ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইংলণ্ড উপনিবেশগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্যের-ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে উপনিবেশ-গুলিতে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ডের পক্ষে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। উপরোক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণ ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করেছিল এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আবিষ্কার সমুহ : শিল্পবিপ্লব প্রথম বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দেখা যায়। জন কে নামে জনৈক ব্যক্তি 'ফ্লাই শাট্‌ল' আবিষ্কার করে দ্রুত-গতিতে চালানোর পক্ষে উপযোগী মাকুর কাজ সহজতর করেন। তাছাড়া হার গ্রীভিসের 'স্পিনিং জেনি', কার্টরাইটের 'পাওয়ারলুম' প্রভৃতিও বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল।

স্পিনিংজেনি

জর্জ ষ্টিফেনশন বাষ্পচালিত শক্তির দ্বারা পরিচালিত রেলগাড়ী আবিষ্কার করে পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। শিল্পোৎ-পাদনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উভয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতির ফলে শিল্প বিপ্লবের দ্বারা ইংলণ্ড একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। ম্যাকাডেম নামে জনৈক ব্যক্তি বছরের সর্বসময়ের জন্য ব্যবহার্য পীচ দেওয়া রাস্তার নির্মাণ

কৌশল আবিষ্কার করার ফলেও পরিবহন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

উপরোক্ত শিল্পজাত দ্রব্য ব্যতীত অপরাপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্লাস্ট ফার্নেস, ডায়নামো, বিদ্যুৎ তৈরীর পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য।

ফলাফল : শিল্পবিপ্লবের সুফল ও কুফল উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত মানের দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তাছাড়া কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অপর দেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের কুফল হিসাবে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন দেশের কুটির শিল্পও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইংলণ্ডে যখন শিল্প বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সময় ভারতে বৃটিশ অধিকার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হলেও ইংরাজগণ এদেশের কর্তৃত্ব মোটামুটি ভাবে দখল করে নিয়েছিল। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ভারতকেও প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হলে ইংলণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে এদেশে বিক্রয় হয়েছিল। এর ফলে ভারতের বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে।

(গ) ফরাসী বিপ্লব : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের জনসাধারন সে যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ করে। এর ফলে ফরাসী দেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং দুর্গত জনসাধারন রাজা, অভিজাত শ্রেণী ও চার্চের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়। ফরাসী দেশের জনসাধারণের কাছে এই বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ।

(১) প্রাক বিপ্লব চিন্তাধারা—(বিপ্লবের কারণ) : ফরাসী বিপ্লবের

জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, দার্শনিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে দায়ী ছিল।

প্রথমতঃ, ফরাসী রাজতন্ত্র ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং নিজ কার্যকলাপের জন্য রাজা জনগণের কাছে দায়ী থাকতে বাধ্য ছিলেন না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। দেশের স্বার্থপর অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা রাজা নিয়ন্ত্রিত হতেন এবং তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ীই রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অভিজাতগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যাকে খুশী কারাগারে নিক্ষেপ করবার জন্য এক ধরণের গ্রেফতারী পরোয়ানা রাজার নিকট থেকে বার করতেন।

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দিক দিয়েও ফ্রান্সে বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। ফরাসীদের সামাজিক বৈষম্যও ফরাসী বিপ্লবের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ফরাসী সমাজে সেই সময় তিনটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, যেমন—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ সম্প্রদায়। যাজক সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকলে ছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার প্রথম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী, অর্থাৎ তাঁরা রাজ্যের সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন, আবার তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন অধিকারহীন শ্রেণী। স্বভাবতঃই তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের উপর আক্রোশের সৃষ্টি হল। তৃতীয়তঃ, ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল খুবইশোচনীয়। যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারই ভোগ করতেন তা নয়, তাঁরা অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধাও ভোগ করতেন। কর দান থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে রাজ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সকল দায়িত্ব তৃতীয় সম্প্রদায়কেই বহন করতে হত। 'গে বেলা' নামক লবণ কর, 'টাইলি' নামক একপ্রকার

প্রত্যক্ষ কর, 'করভি' নামক শ্রম কর ব্যতীত আরও নানা করের বোঝা তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বহন করতে হত। ফলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের আয়ের মাত্র এক পঞ্চমাংশ তাদের হাতে থাকত। দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন মানুষকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল, সে সময় ফরাসী দার্শনিকগণ তাঁদের রচনার মাধ্যমে ফরাসী রাজতন্ত্রের দোষক্রটি জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন।

কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য নতুন ভাবধারা এনে দিলেন। তাঁদের লেখাতে ফুটে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং সেই সঙ্গে মুক্তির দাবী।

রুশো : রুশো নামে একজন প্রতিভাবান লেখক দেশের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাকেই উল্টে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন যে প্রজা সাধারণের সমবেত ইচ্ছা এবং সমর্থনই হচ্ছে রাজতন্ত্রের ভিত্তি। কাউকে রাজপদে নিয়োগ করা অথবা বরখাস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার প্রজাসাধারণের আছে। 'সামাজিক চুক্তি' নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্রের দাবী প্রতিষ্ঠা করলেন। রুশোর লেখা পড়ে সমস্ত দেশময় অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের ভাব ছড়িয়ে পড়ল।



রুশো

ভল্‌তেয়ার : ভল্‌তেয়ার তাঁর অমর লেখনীর সাহায্যে স্বৈরাচারী রাজশক্তি ও যাজকদের আক্রমণ করলেন। তাঁর লেখা পড়ে জনসাধারণের মন থেকে রাজা এবং পুরোহিতদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘুচে গেল।

মন্টেস্কু : মন্টেস্কু 'দি পারশিয়ান লেটার্স' নামক গ্রন্থে পরিহাসছলে ফরাসী সমাজের দোষক্রটির সমালোচনা করেছেন। তিনি তাঁর 'স্পিরিট অব দি লজ' গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী করেছেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের সাফল্যও ফরাসীবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ; তাছাড়া

ফ্রান্সের বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ফরাসীরাজের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আর্থিক সাহায্য দান। এই সাহায্য দানের ফলে একদিকে যেমন ফরাসী সরকারের অর্থ-সংকট বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি বিপ্লবের পথও প্রশস্ত হয়েছিল।

বিপ্লবের প্রসার : ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজা ষোড়শ লুই অর্থ-সংকটের হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে ফরাসী প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করেন।

ষোড়শ লুই

প্রায় দু'শ বছর ধরে ফ্রান্সের কোন রাজা এই সভার কোন অধিবেশন ডাকেননি। ষোড়শ লুই ভেবেছিলেন যে, মহাসভা তাঁর আর্থিকসংকট দূর করে দেবে। কিন্তু তাঁরা রাজার সংকট দূর করা তো দূরের কথা, বরং এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রচার করতে চাইলেন। রাজা অধিবেশন গৃহে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কিন্তু এতে প্রতিনিধিরা থামলেন না। তাঁরা সভাগৃহের অদূরে টেনিস মাঠে মিলিত হয়ে দেশের নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁরা তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় উত্তেজিত জনগণ ১৭৮৯ খ্রীঃ ১৪ই জুলাই বাস্তিল নামক জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের খালাস করে বিপ্লব শুরু করল। রাজা ও রাণী পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। জাতীয় পরিষদের নতুন সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এই সময়ে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া একযোগে ফ্রান্স আক্রমণ করে। এই জন্য প্রতিনিধি সভা রাজাকেই দায়ী করল। বিচারে রাজা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গিলোটিন নামক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর মস্তক ছেদন করা হয়। কিছুকাল সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। এই সময়ে রোবস্পিয়র নামে একজন বিপ্লবীও গিলোটিনে প্রাণ দেন।



ষোড়শ লুই

(২) বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন—ইউরোপে বিদ্রোহ : রোবস্‌পিয়রের পতনের পর ফ্রান্সের শাসনভার অর্পিত হয় পাঁচজন ডিরেক্‌টরের উপর। পাঁচ বছর ধরে তাঁরা ফ্রান্স শাসন করেন। তাঁরা প্রজাতন্ত্র রক্ষা করেন। তখনও অস্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল। ডিরেক্‌টরগণ কী যুদ্ধ পরিচালনায়, কী দেশের শাসন পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মানুষকে খুশি করতে পারলেন না। একবার প্যারিসের উগ্র জনতা তাদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়। তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক এক যুবক সেনাপতি জনতাকে দমন করে তাঁদের রক্ষা করেন। তারপর শুরু হয় নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি।

নেপোলিয়ন

ইটালীতে ফরাসী সৈন্যদলের নেতার পদ লাভ করে যুবক নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সকল শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পর পর ভীষণভাবে পরাজিত করেন এবং অস্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেন। কয়েক বছর পর ডিরেকটরদের দূর করে নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল নামে ফ্রান্সের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তু'বছর পর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকের ভোটে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হন। সংঘবদ্ধ ইউরোপের রাজাদের সঙ্গে পর পর নেপোলিয়নকে যুদ্ধ করতে হয়। ইংলণ্ড ছিল তাঁর প্রধান শত্রু। কিন্তু শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে ইংলণ্ড রক্ষা পায়। ইউরোপের অপর রাজারা পর পর নেপোলিয়নের হাতে পরাজিত হন। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ছিল অসাধারণ। তাঁর ভাইবোনেদের তিনি বিভিন্ন দেশের রাজা বা রাণী করেন। শেষে রাশিয়া জয় করতে গিয়ে তাঁর সৈন্য দল বিনষ্ট হয়।

নেপোলিয়ন কেবল একজন অসাধারণ সেনাপতি ছিলেন না, একজন সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় ফ্রান্সের সকল দিকে উন্নতি হয়। যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যে কোন ব্যক্তি উচ্চতম পদ লাভ করতে পারতেন। এক কথায় তাঁর সময়ে ফ্রান্সে

আইনের চোখে সকলেই সমান ছিল। তিনি বহু জনহিতকর সংস্কার সাধন করেন।

এই সময়ে ইউরোপের শক্তিবর্গ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করে প্রাশিয়া। বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নের কবল থেকে জার্মানির মুক্তি। লাইপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হন। এলবা দ্বীপে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং পুনরায় ফ্রান্সের সম্রাট হন।



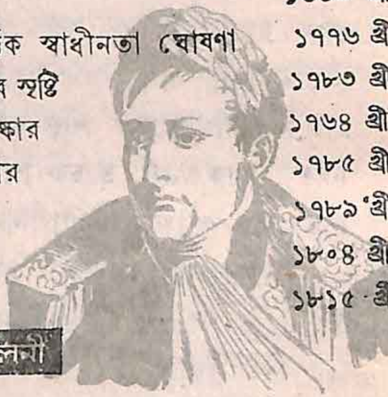
নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি ফ্রান্স ঘিরে ফেলে। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ওয়াটালু´র যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত হন। তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে রাখা হয়; কিছুকাল পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

(৩) **ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল :—** ফরাসী বিপ্লব একটি পুরাতন যুগের অবসান এবং নতুন যুগের অরুনোদয় সূচিত করল। জীর্ণ পুরাতন যুগের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার দিনগুলি আর ফিরে এল না। নেপোলিয়নের পতনের পর ফরাসী রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও সামন্ত আমলের দাসত্ব পুনর্জীবিত হল না। যে জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল তা আর পূর্বেকার অভিজাত সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেওয়া হল না। মাঠের কৃষক ও শহরের সাধারন লোকের অবস্থা আগের তুলনায় অনেকখানি স্বচ্ছল হল। তখন ইউরোপের সর্বত্র ছিল স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের রাজত্ব। ফ্রান্সের বাইরেও বিপ্লব পন্থীদের তুর্যনিনাদ উনবিংশ শতাব্দীর নির্যাতিত জনগণের কাছে বয়ে নিয়ে এল সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির বাণী। এতে ইউরোপের পরবর্তী কালের ইতিহাসও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

কালপঞ্জী

আমেরিকার নেভিগেশন এ্যাক্ট	১৬৬০ খ্রীঃ
আমেরিকার স্ট্যাম্প এ্যাক্ট	১৬৬৩ খ্রীঃ
আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা	১৭৭৬ খ্রীঃ
আমেরিকার তেরটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি	১৭৮৩ খ্রীঃ
হারগ্রীভিসের স্পিনিং জেনি আবিষ্কার	১৭৬৪ খ্রীঃ
কার্টরাইটের পাওয়ার লুম আবিষ্কার	১৭৮৫ খ্রীঃ
ফ্রান্সে বাস্তিল দুর্গের পতন	১৭৮৯ খ্রীঃ
নেপোলিয়নের সম্রাট পদ লাভ	১৮০৪ খ্রীঃ
ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ	১৮১৫ খ্রীঃ



অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ⁂ ৯নম্বর

১। 'যুক্তিবাদের যুগ' বলতে কি বুঝায় ?
২। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।
৩। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ গুলি উল্লেখ কর।
৪। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?
৫। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণ গুলি বর্ণনা কর।
৬। শিল্প বিপ্লবের যুগে বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।
৮। কি কি কারণে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ?
৯। ফরাসী বিপ্লব কিভাবে প্রসার লাভ করে ?
১০। নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ⁂ ৩নম্বর

১। নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে তিন চার লাইনের মধ্যে লেখ :
(ক) স্ট্যাম্প এ্যাক্ট, (খ) এডমণ্ড বার্ক, (গ) কৃষিবিপ্লব, (ঘ) রুশো, (ঙ) ভলতেয়ার, (চ) মন্টেস্কু (ছ) ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ---------- **এক নম্বর**

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আমেরিকায় কে 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' জারী করেন ?

(খ) এডমণ্ড বার্ক কে ছিলেন ?

(গ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি কে ছিলেন ?

(ঘ) টাউনসেণ্ড কি আবিষ্কার করেছিলেন ?

(ঙ) শিল্পবিপ্লব প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল ?

(চ) 'সামাজিক চুক্তি' কার লেখা ?

(ছ) মণ্টেস্কুর রচিত একটি গ্রন্থের নাম কর।

(জ) কবে বাস্তিলের পতন ঘটে ?

(ঝ) নেপোলিয়ন কত খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হন ?

(ঞ) ডিউক অফ ওয়েলিংটন কে ছিলেন ?

২। বাঁ দিকে কয়েকটি জিনিস এবং ডানদিকে কয়েকজন আবিষ্কারকের নাম দেওয়া রয়েছে। সাজিয়ে লিখ।

(ক) ফ্লাই শাট্‌ল	(ক) হারগ্রীভস
(খ) পাওয়ার লুম	(খ) ম্যাকাডেম
(গ) স্পিনিং জেনি	(গ) জর্জ স্টিফেনশন
(ঘ) পীচের রাস্তা	(ঘ) জন কে
(ঙ) রেলগাড়ী	(ঙ) কার্টরাইট

অধ্যায়

নয়

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস

(ক) **জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি—মেটারনিকের কার্যাবলী**ঃ নেপোলিয়নের পতনের পর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এক ইউরোপীয় মহাসম্মেলন বা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (১৮১৫খ্রীঃ)। এই সম্মেলন 'ভিয়েনা সম্মেলন' নামে পরিচিত। ইউরোপের সব দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিলেও নেপোলিয়ন বিজয়ী চারটি শক্তি, যথা—ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এই সম্মেলনের প্রধান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে যে রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রধান ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসল্‌রি এবং ফ্রান্সের মন্ত্রী ট্যালির‍্যাণ্ড।

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান পরিচালক ছিলেন মেটারনিক। তিনি ছিলেন একজন ধুরন্দর কূটনীতিবিদ্‌। তাঁর সুদর্শন চেহারা, আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী ও আইনের সূক্ষ্ম জ্ঞান তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরো বড় করে তোলে।

মেটারনিক

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের বিরোধী, পুরাতন পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর চিন্তাধারা ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রাক্কালে বৃহৎ শক্তিবর্গ উচ্চ আদর্শের বুলি উড়িয়েছিল। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি বড় বড় কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল এইগুলি কথার কথা মাত্র। বিপ্লবের ভাবধারাকে গ্রহণ করে ইউরোপের পুনর্গঠন করা রক্ষণশীল শক্তিবর্গের মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

দীর্ঘ আলোচনার পর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ তিনটি নীতি গ্রহণ

করেন—ন্যায্য অধিকার, শক্তিসাম্য ও ক্ষতিপূরণ। ন্যায্য অধিকার নীতির অর্থ হল নেপোলিয়ন যে সব রাজবংশকে উচ্ছেদ করেন তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা



করা। এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশকে, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ রাজবংশকে, স্পেনে বুরবোঁ রাজবংশের অপর শাখাকে, পিডমণ্ট রাজ্যে

স্যাভয় রাজবংশকে, পোপের রাজ্য পোপকে, নেপলস্ ও সিসিলিতে বুরবোঁ রাজবংশের অপর শাখাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। বেলজিয়াম ও নরওয়ের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়।

শক্তিসাম্য নীতির অর্থ হল ফ্রান্স যাতে আর ইউরোপ আক্রমণ করতে না পারে এই জন্য ক্ষমতা বণ্টন করা। এই নীতি অনুসারে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গড়া হল। রাইন অঞ্চলকে প্রাশিয়ার সঙ্গে, স্যাভয় ও জেনোয়াকে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হল। এইভাবে ফ্রান্সের চারদিকে শক্তি বৃদ্ধি করা হল।

ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী যেসব রাষ্ট্র নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হল। এর ফলে অস্ট্রিয়া পেল লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া, টাইরল, সালজাবার্গ ও ইলিরিয়া; প্রাশিয়া পেল স্যাক্সনীর প্রায় অর্ধাংশ, পোল্যাণ্ডের এক-চতুর্থাংশ ও পমিরেনিয়া; রাশিয়া পেল ফিনল্যাণ্ড, বেসারাবিয়া ও পোল্যাণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ; ইংলণ্ড পেল ইউরোপের বাইরে মাল্টা, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, হেলিগোল্যাণ্ড, ট্রিনিদাদ, মরিশাস, সিংহল ও উত্তমাশা অন্তরীপ।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা গেল যে ভিয়েনা সম্মেলনের বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করে। তাঁরা ফরাসী বিপ্লব প্রসূত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে একেবারে নস্যাৎ করে দেয়।

এর পিছনে মেটারনিকের একটা উদ্দেশ্য ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌সবার্গ সাম্রাজ্য ছিল অনেকগুলি জাতি ও ভাষা-ভাষী সমন্বয়ে গঠিত। এখানে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হলে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হত। এই কারণেই মেটারনিক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। কেবলমাত্র অস্ট্রিয়াতে এই ভাবধারা দমন করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। তাই তিনি সমগ্র ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালু করেন।

চতুঃশক্তি মিতালি : ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কাজে রূপায়িত

করার জন্য শীঘ্রই মেটারনিক "চতুঃশক্তি মিতালি" নামে এক চুক্তি রচনা করেন। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল চতুঃশক্তি মিতালির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এর পূর্বে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার 'পবিত্র চুক্তি' নামে যে আন্তর্জাতিকশক্তি সমবায় গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়। 'চতুঃশক্তি মিতালি'র উপর ভিত্তি করে ইউরোপে পুনরায় শক্তি সমবায় গঠিত হয় এবং পর পর এর কয়েকটি বৈঠকও হয়। কিন্তু এত সব করেও গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে তাঁরা রুখতে পারলেন না। নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধের জন্য শক্তি সমবায় ব্যর্থ হল। ইতিহাস তার নিজের গতিতেই চলতে লাগল।

(খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্য যাদের কাম্য, তাদের বলা হয় জাতীয়তাবাদী। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ইউরোপে ক্রমে সকল সভ্য দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরাধীন ও কয়েকটি রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন ইটালীয়গণ স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য লাভ করে; আর বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানি একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে নেপোলিয়ন ইটালী ও জার্মানি জয় করেন; এবং নেপোলিয়নের বিজয়ই উভয়ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা যোগায়।

ইটালীর ঐক্যলাভের পূর্ব অবস্থা ঃ উনিশ শতকে ঐক্যলাভের পূর্বে ইটালীর উত্তর-পূর্ব অংশ ছিল অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে। দক্ষিণভাগে নেপল্‌স্ ও সিসিলি দ্বীপ ছিল ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজবংশের একশাখার অধীন। মধ্য ইটালীতে পোপ এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করতেন। কেবল দক্ষিণ-পূর্বে পিডমন্ট প্রদেশটি ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ ইটালীর একমাত্র দেশীয় রাজবংশের অধীন ছিল। নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ইটালীয়গণ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ না করলেও কিছুকালের জন্য ইটালী এক হয় এবং ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রভাবে তাদের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের রাজারা ভিয়েনায় মিলিত হয়ে

ইউরোপে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান। ইটালীর উত্তর পূর্বে আবার অস্ট্রিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; বিতাড়িত বুরবোঁ রাজা আবার নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন টিকল না।

ইটালীর স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস ও তার নেতৃবৃন্দ : নবীন ইটালীর স্বাধীনতার হোতা ছিলেন ম্যাৎসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডী। এদের জীবনব্যাপী সাধনায় একতাবদ্ধ ইটালী পুনরায় ইউরোপীয় মানচিত্রে দেখা দিল। স্বাধীন ইটালী ছিল ম্যাৎসিনির কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের সাধনা। তিনি বলতেন, "ইটালী তখনই বাঁচবে যখন তার সন্তানগণ প্রাণ বিসর্জন দিতে শিখবে। এর জন্য শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন

ম্যাৎসিনি

শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের। ম্যাৎসিনি দেশকে স্বাধীন করবার জন্য 'নবীন ইটালী' নামক একটি বিপ্লবী সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। অবশেষে ইটালীর তৎকালীন রাষ্ট্রনায়কেরা ম্যাৎসিনিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু ম্যাৎসিনির কাজ অসমাপ্ত রইল না। কর্মবীর কাভুর এবং গ্যারিবল্ডী ম্যাৎসিনির আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

কাভুর : কাভুর ছিলেন ইটালীর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মন্ত্রী। ঐ রাজ্যের নাম ছিল পিডমণ্ট সার্ডিনিয়া। এর রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ভিক্টর এমানুয়েল। কাভুরের পরামর্শে পিডমণ্ট রাজ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রান্সকে সাহায্য করেছিল। তখন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। কাভুর বুঝেছিলেন যে, নেপোলিয়নের সাহায্য ব্যতীত ইটালীর উত্তরাংশ থেকে অস্ট্রিয়গণকে বিতাড়িত করা যাবে না। সুতরাং ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে



কাভুর

কাভুর সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে ইটালীর অধিকাংশ স্থান থেকে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর তা পিডমণ্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

গ্যারিবল্ডীঃ এইবার ইটালীর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন গ্যারিবল্ডী। বয়সে ম্যাৎসিনি অপেক্ষা মাত্র তু বছরের ছোট হলেও ম্যাৎসিনিকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হননি। কৈশোরে তিনি ম্যাৎসিনি প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি 'তরুণ ইটালী সঙ্ঘের' সভ্য হন। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তিনি বহুকাল নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিলেন। তারপর পুনরায় দেশে ফিরে কাভুরের সঙ্গে মিলিতভাবে ইটালীর মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তারপর সিসিলির বিদ্রোহীদের আহ্বানে গ্যারিবল্ডী পর বছরই এক সহস্র লালকোর্তা সৈন্য নিয়ে সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করলেন।



গ্যারিবল্ডী

গেরিলা যুদ্ধে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ঐ বিপ্লববাহিনী (লালকোর্তা) দ্বারা সিসিলিকে পদানত করে অবশেষে তিনি দক্ষিণ ইটালীতে পদার্পণ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর পতাকা তলে সমবেত হল। দক্ষিণ ও মধ্য ইটালী বিজয় সমাপ্ত হলে পিডমণ্ট রাজা ভিক্টর এমানুয়েল ইটালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করলেন। এটা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এর কয়েকবছর পর ভেনিস এবং রোমও নবগঠিত ইটালী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। প্রাচীন যুগের মহিমামণ্ডিত রোম আবার নবজাগ্রত ইটালীর রাজধানী হল।

বিচ্ছিন্ন জার্মানি :— সপ্তদশ শতকেও জার্মানি প্রায় তিনশত স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অবশ্য এই রাজ্যগুলির অধিকাংশই ছিল অতি ক্ষুদ্র

কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী কেল্লার অধিকারী বা কোন শহরের বিশাল স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আচরণ করতেন। নেপোলিয়ন কতকগুলি জার্মান রাজ্য নিয়ে একটি যুক্ত জার্মান রাজ্য গঠন করেন এবং তাকে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে খাড়া করেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের রাজারা ভিয়েনায় মিলিত হয়ে জার্মানির রাজ্য-সংখ্যা হ্রাস করে উনচল্লিশে আনয়ন করেন। তাদের মধ্যে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া ছিল শক্তিশালী ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

জার্মানগণের ঐক্যলাভের চেষ্টা ঃ ১৮৪৮ সনে ইউরোপের অন্যত্র যেমন, জার্মানিতেও তেমনি জাতীয় ঐক্যের দাবি প্রবল হয় এবং প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতিকে এক করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়া তার দীর্ঘকালের জার্মানজাতির নেতৃত্ব ত্যাগ করবে কেন? তাই জার্মানিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা তখন সম্ভব হল না; শেষে যে শক্তিমান ব্যক্তি জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন তাঁর নাম বিসমার্ক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন এমন কেউ ইউরোপে ছিলেন না।

বিসমার্কের লক্ষ্য ঃ বিসমার্ক ছিলেন প্রুশিয়ার মন্ত্রী। তাঁর জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রুশিয়াকে সম্মিলিত জার্মানির নেতার আসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইউরোপের সর্বপ্রধান শক্তিতে উন্নীত করা। তাঁর এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স। তাই বিসমার্কের প্রথম কাজ হল জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ করা। এই লক্ষ্য সাধনের একটি মাত্র উপায়ই বিসমার্ক মানতেন—যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করা। তাই তাঁর উৎসাহে জার্মান সৈন্যদল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদল



বিসমার্ক

হয়ে উঠে। তিনি প্রজা-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন বটে; তবে তিনি আবার প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করে দেশকে শক্তিশালী করেন।

জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ বিসমার্ক বহুদিন ধরে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স জয়ের জন্য নিখুঁত আয়োজন করতে থাকেন। ১৮৫০ সনে ইটালী ও ফ্রান্স যখন একযোগে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে তখন বিসমার্ক চুপ করে থেকে অস্ট্রিয়ার বলক্ষয় হতে দেন। তারপর ১৮৫৬ সনে বিসমার্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইটালী প্রুশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং জার্মানির উপর তার নেতৃত্ব হারায়।

তারপর এল ফ্রান্সের সঙ্গে বোঝাপড়ার পালা। সেই সময় ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ বলে বিবেচিত হতো। বিসমার্ক ফ্রান্স আক্রমণের সব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। সেই ব্যবস্থা নাকি এতই সুনিশ্চিত ও নিখুঁত যে, যুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্যগণের প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিসেরও অভাব হলোনা, অপরদিকে ফ্রান্সের সেনাপতিগণ যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিন সপ্তাহের মধ্যেই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রধান ফরাসী সৈন্যদল সহ জার্মানদের হাতে বন্দী হন, বিজয়ী জার্মানগণ প্যারিস অবরোধ করে। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বাদে অপর সকল জার্মান রাজ্য যোগ দিয়েছিল। প্যারিসের অদূরে ভার্সাই রাজপ্রাসাদে ১৮৭১ সনে সমবেত জার্মান রাজগণ প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট নির্বাচন করেন। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক জার্মানির প্রথম সম্রাট হন। এইরূপে নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের জন্ম হয়।

জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : সূচনা ঃ নবীন ইটালী এবং জার্মানির অভ্যুদয়কালে আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথার অবসান হয়। দাসত্ব প্রথার সূচনা মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই। রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগেও দাসত্ব প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর দাসত্ব প্রথা ক্রমে ক্রমে ইউরোপ থেকে অন্তর্হিত হয়।

এরপর ইউরোপীয় জাতি সমূহ যখন সাগরের পরপারে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করে তখন তারা আবার প্রাচীন রোমের মত দাসত্বপ্রথার পুনঃ প্রবর্তন করল। আফ্রিকার উপকূল থেকে হতভাগ্য নিগ্রোদিগকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম ব্যবসায়ীরা আমেরিকার ক্ষেত খামারের মালিকদের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করত। এই সমস্ত দাসদের জীবন ছিল দুঃসহ কষ্টের। তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ক্ষেত খামারে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মানুষের বিবেক বুদ্ধিও অধিকতর জাগ্রত হওয়ায় কালক্রমে দাসত্ব প্রথার অবসান হলো। ইংলণ্ড দাসত্ব প্রথার অবসানে পথপ্রর্দশক হল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ: আমেরিকাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দাসত্ব প্রথার অবসান নিয়ে এক গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের দেশগুলি ছিল ব্যবসা ও শিল্পে উন্নত; সেখানে প্রয়োজন হতো স্বাধীন গতিবিধি সম্পন্ন শ্রমিকদের। দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি ছিল ইক্ষু ও তামাক চাষে সমৃদ্ধ। সুতরাং দক্ষিণের খেত খামারের মালিকেরা মনে করত যে, দাসদের দিয়ে কাজ না করলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এইজন্য দক্ষিণাঞ্চলের শ্রমজীবিরা ছিল দাস আর উত্তরাঞ্চলের শ্রমজীবীরা ছিল স্বাধীন। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে বয়নশিল্পে বিপ্লব ঘটেছিল। তারপর সূতা পেঁজার যন্ত্র আবিস্কৃত হওয়ায় তুলার চাহিদা অনেক বেড়েছিলো। দক্ষিণাঞ্চলের তূলা উৎপাদনকারীরা প্রচুর অর্থের আশায় আরো দাম দিয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর হলো। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হতে লাগল, তখন উত্তরাঞ্চলের আমেরিকানগণ সেখানে স্বাধীন শ্রমিক আমদানি করতে চাইল, আর দক্ষিণাঞ্চলের আমেরিকানগণ চাইল দাসত্ব প্রথার প্রবর্তন করতে। সুতরাং স্বাধীন শ্রমিক এবং দাস শ্রমিককে কেন্দ্র করে এক আত্মঘাতী সংগ্রামের সূচনা হল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা: দাসত্ব প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য যিনি দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তিনি

অবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। এতে সমস্যাটি জটিল আকার ধারণ করলো। এই বিখ্যাত মানবদরদী মহাপুরুষের নাম আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি দীর্ঘকায়, শীর্ণকায় পুরুষ ছিলেন, তাঁর ভগবদ্ভক্তি ছিল অপরিসীম। তাঁর মনটি শিশুর মত কোমল হলেও তিনি কোন বিষয়ে মনঃস্থির করলে তাঁকে সংকল্পচ্যুত করা দুঃসাধ্য ছিল। তাঁর শাসনে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল দাসপ্রথা বিলুপ্ত হবে মনে করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। সুতরাং তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন একটি গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করলো। এ থেকেই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হলো। এই রক্তক্ষয়কারী গৃহবিবাদ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চলেছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ যখন ভীষণভাবে চলছিল তখন লিঙ্কন এক ঘোষণা দ্বারা দেশ থেকে দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ করে দিলেন। এই গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চল অবশেষে বিজয়ী হওয়ায় দেশ থেকে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হলো, দেশ বিভাগের আশঙ্কা তিরোহিত হলো। এইরূপে আমেরিকার নিগ্রোগণ স্বাধীন নাগরিক হলো। কিন্তু যার প্রচেষ্টায় দাসদের মুক্তিলাভ ঘটল, মুক্তির দুবছর পরেই দক্ষিণাঞ্চলের এক আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে সেই মহানুভব লিঙ্কন প্রাণত্যাগ করেন। যদিও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দের পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করছে, তবুও আমেরিকার অনেক অঞ্চলে এখনো বর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে।



আব্রাহাম লিঙ্কন

(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের যে চরম উৎকর্ষতা দেখা দিয়েছিল ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে তা বিস্তার লাভ করলো। পরবর্তীকালে ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইটালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রসার ঘটে। এর মূলে ছিল

যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রস্তুতি। ইংলণ্ডের মত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী হতে লাগল। এক সময়ে যন্ত্র ছিল মানুষের হাতিয়ার; পরবর্তীকালে মানুষ হলো যন্ত্রের দাস। যন্ত্রপাতির কল্যাণে শিল্পের যত উন্নতি হতে লাগল শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলি ততই শক্তিশালী হয়ে উঠল। শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাই যে কোন দেশের উন্নতির মানদণ্ড বলে গণ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের এই শিল্পায়ন বা যন্ত্র সভ্যতা সেখানকার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রধান সোপান।

ফলাফল ঃ শিল্পের অগ্রগতির ফলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইউরোপের শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলি প্রচুর পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করতো এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করত।

শিল্পায়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হলো। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে অতি আধুনিক ধরণের বিলাস দ্রব্য পর্যন্ত সব কিছুই মানুষের নাগালের মধ্যে এল।

যন্ত্র সভ্যতার ফলেই পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে। আর এই পুঁজিবাদ মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তারই পরিণাম হলো শ্রেণী সংগ্রাম।

যন্ত্র সভ্যতার ফলে ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিককে খাটিয়ে বহু মুনাফা পায়। অধিক মুনাফার লোভে মালিকরা শ্রমিকদের বেশী খাটায় ও কম মজুরী দেয়। শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে এর প্রতিবাদ জানায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজের এই বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করবার জন্য চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তার ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। ইংলণ্ডের রবার্ট আওয়েন সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের পথ প্রদর্শক হলেন কার্ল মার্কস।

কার্ল মার্কস ঃ কার্ল মার্কস ছিলেন জাতিতে জার্মান-ইহুদী। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। তিনি জার্মানির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি এক পত্রিকার অফিসে সংবাদদাতার চাকুরি করেন। মার্কস ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' নামক সাম্যবাদী মতবাদের গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পরে 'ডাস ক্যাপিটাল' ও আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের মৃত্যু হয়। তাঁর সাম্যবাদী ভাবধারা আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বেশ প্রভাবিত করেছে।



কার্ল মার্কস



এঞ্জেলস

এঞ্জেলস : কার্ল মার্কসের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন এঞ্জেলস। মার্কস যখন প্যারিসে নির্বাসিত জীবন কাটান তখন এঞ্জেলস-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেই থেকে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। মার্কসের সাংসারিক অভাব অনেক পরিমাণে এঞ্জেলস-এর দাক্ষিণ্যে দূর হয়। মার্কস ও এঞ্জেলস যুক্তভাবে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করেছিলেন।

কালপঞ্জী

ভিয়েনা কংগ্রেস	১৮১৫ খ্রীঃ
মেটারনিকের যুগ	১৮১৫—১৮৪৮ খ্রীঃ
চতুঃশক্তি মিতালি	নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ
ম্যাৎসিনি	১৮০৫—১৮৭২ খ্রীঃ
কাভুর	১৮১০—১৮৬১ খ্রীঃ

গ্যারিবল্ডী	১৮০৭—১৮৮২ খ্রীঃ
ইটালীর স্বাধীনতা লাভ	১৮৬১ খ্রীঃ
বিসমার্ক	১৮১৫—১৯১৮ খ্রীঃ
জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা	১৮৭১ খ্রীঃ
আমেরিকার দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ	১৮৬৩ খ্রীঃ
কার্লমার্কস	১৮১৮—১৮৮৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৯নম্বর**

১। মেটারনিক কিভাবে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন ?

২। ইটালীর ঐক্যলাভের কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। বিসমার্ক কিভাবে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

৫। ইউরোপের শিল্পায়ন ও তার ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ **৩নম্বর**

১ ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগুলি উল্লেখ কর ?

২। "চতুঃশক্তি মিতালি" বলতে কি বোঝ ?

৩। ঐক্য লাভের পূর্বে ইটালীর অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৪। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা উল্লেখ কর ?

মৌখিক প্রশ্ন ❋ ❋ ❋ **এক নম্বর**

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান পরিচালক কে ছিলেন ?

(খ) 'নবীন ইটালী' কে গঠন করেছিলেন ?

(গ) ইটালী কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে ?

(ঘ) বিসমার্ক কে ছিলেন ?

(ঙ) কবে জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয় ?

(চ) আমেরিকার কোন্ প্রেসিডেন্ট দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করেন ?

(ছ) 'ডাস ক্যাপিটাল' কে রচনা করেন ?

অধ্যায়

দশ

চীন ও জাপানের কথা

(ক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ ঃ চীনদেশের আয়তন অতি বিশাল এবং এর সভ্যতাও সুপ্রাচীন। বহুকাল চীনের অধিবাসীরা বর্হিজগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখত না। কিন্তু চীনের প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় বণিকগণ দলে দলে চীনের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। তারা চীনে অর্থ নৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই অর্থ নৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চীনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

অহিফেন যুদ্ধ ঃ এই সময়ে চীনে রাজত্ব করতেন মাঞ্চু বংশীয় সম্রাটগণ। তাঁরা বিদেশীদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী ছিলেন না। ইংরাজরা যাতে চীনে বাণিজ্য করতে পারে এই আবেদন নিয়ে ইংলণ্ডের রাজদূতেরা কয়েকবার চীন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ইংরাজ বণিকরা তখন গোপনে চীনে আফিং পাঠাত। চীনারা ক্রমে আফিং-এর নেশায় অভ্যস্থ হল। চীনাদের এই নেশা দূর করার জন্য চীন সম্রাট আফিং-এর ব্যবসা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। ইংরাজ বণিকরা সে নিষেধ শুনল না। শেষে ক্যান্টন শহরের এক রাজকর্মচারী ইংরাজদের বহু টাকার আফিং আটক করলে চীনের সঙ্গে ইংরাজদের এক যুদ্ধ বাধে (১৮৩৯ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধকে বলা হতো অহিফেন যুদ্ধ। তিন বছর ধরে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত চীনারা পরাজিত হয়।

নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২ খ্রীঃ)—বৃটিশ বাণিজ্যিক চুক্তি ঃ অহিফেন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীনারা ইংরাজদের সঙ্গে নানকিং শহরে এক সন্ধি

করে (১৮৪২ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্ত অনুসারে চীনের পাঁচটি বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্য করবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি বন্দর হলো ক্যান্টন, নিংপো, ফুচাও, সাংহাই ও এময়। তাছাড়া হংকং বন্দরটি ইংরাজদের নিকট ছেড়ে দিতে হলো।

এতকাল কোহং নামে চীনের একটি বণিক সংঘের সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্য চলত। এখন চীনের সঙ্গে বৃটিশ বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে চীনের সঙ্গে ইংরাজদের সরাসরি বাণিজ্য শুরু হয় এবং কোহং এর মারফৎ ব্যবসার আইন বাতিল হয়ে যায়।

টিয়েনসিনের সন্ধি ও বন্দর চুক্তিঃ তারপর থেকে ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও এই পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্য করতে লাগল। এই সময়ে তারা ভিতরে ভিতরে চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেদের ক্ষেপিয়ে তোলে। এই ব্যাপারে ধরা পড়ে একজন ফরাসী পাদরীর প্রাণদণ্ড হয়। তাছাড়া 'লরচা' নামে এক মালবাহী জাহাজ বৃটিশ সরকারের পতাকা উড়িয়ে গোপনে আফিং চালান দেওয়ার সময় চীন সরকার কর্তৃক ধৃত হয়। অবশ্য এই মালবাহী জাহাজটির প্রকৃত মালিক ছিল একজন চীনা-ব্যবসায়ী। এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে। দুর্বল চীনের পক্ষে বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি, টিয়েনসিন শহরে দু'পক্ষে সন্ধি হলো ১৮৫৮ খ্রীঃ।

এই সন্ধির শর্ত অনুসারে স্থির হলো যে বিদেশী বণিকরা চীনের এগারোটি বন্দরে বাণিজ্য করতে পারবে। বন্দর চুক্তির ফলে ইংরাজরা হংকং বন্দরটি পেল। টিয়েনসিন সন্ধির শর্ত অনুসারে আরো স্থির হলো যে, চীনের রাজধানীতে বিদেশীদের দূতাবাস থাকবে।

চীনে বিদেশীদের বসতি ও অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ : ইংরাজ ও ফরাসীদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আমেরিকা, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করে। এইভাবে চীনের বন্ধ দুয়ার বাইরের জগতের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। চীনে

বিদেশীদের বসতি শুরু হয়ে গেল। এই সঙ্গে চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হল। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী চীনের আইন অনুসারে বিদেশীদের বিচার হত না। তারা তাদের নিজেদের দেশের আইনের সুযোগ পেত।

চীনের ভাগ নিয়ে বিদেশীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা : এরপর ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর জাপান ফরমোজা দ্বীপ অধিকার করে এবং কোরিয়ার উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা নবোদ্যমে চীনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভাগ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করে। এই সময়ে রাশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দরের ইজারা নেয় এবং মাঞ্চুরিয়ায় কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে জার্মানি কিয়াও-চাও বন্দরে এবং শাণ্টুং প্রদেশে, ফ্রান্স কোয়াংসি ও ইউনান প্রদেশে এবং ইংলণ্ড কৌলুনে এবং ইয়াংসি উপত্যকায় নিজেদের বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে চীনকে খণ্ড খণ্ড করায় তার স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

হের উন্মুক্তদ্বার নীতি (১৯০১ খ্রীঃ) : চীনের এই অবস্থা দেখে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দাবি করলেন যে, কোন শক্তিই চীনের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে পারবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গোটা চীন দেশটাকেই সকলের জন্য খোলা রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা হের 'উন্মুক্তদ্বার নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতি ঘোষিত হওয়ায় চীনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পেল না।

চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩খ্রীঃ) : বিদেশীদের এই অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। শুধু বণিকদের নয়, খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের কার্যকলাপও চীনবাসীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করল।

এই সময়ে চীনে এক ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হয় (১৮৫৩ খ্রীঃ)। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন হাং-সিন-চুয়াং নামে চীনের একজন ধর্ম

প্রচারক। হাং নিজেকে যীশুখ্রীষ্টের ভাই বলে দাবি করেন। তিনি চীনে এক নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করতে এগিয়ে এলেন। এই নতুন শাসন ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় 'তাইপিং' অর্থাৎ পূর্ণ শান্তি। এই আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। হাং-সিন-চুয়াং মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁর অনুচরদের নিয়ে কোয়াংসি থেকে উত্তর দিকে অভিযান করেন। তিনি নানকিং দখল করেন এবং সাময়িকভাবে সেখানে একটি রাজধানী স্থাপন করতে সমর্থ হন।

তাইপিং মতবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের অনেকটা মিল ছিল। ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্টগণ হাং-সিন-চুয়াং-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিদেশী বণিকরাও তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহ দীর্ঘ বার বছর ধরে চলেছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে বৃটিশ সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন গর্ডনের তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একশ দিনের সংস্কার : (১৮৯৮ খ্রীঃ) আবার এই সময়ে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ও দেশের অধঃপতিত অবস্থার জন্য দুর্বল মাঞ্চু সরকারকে দায়ী করে। তারা শাসন-সংস্কারের দাবি জানাতে থাকে। তাদের চাপে পড়ে সম্রাট কোয়াংসু দেশে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন (১৮৯৮ খ্রীঃ)। চীনের পুরানো পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা হলো। স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচীতে বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলো। বিদেশী পুস্তক অনুবাদের ব্যবস্থা হলো। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরানো আইনের সংস্কার-সাধন করা হয়। যুদ্ধবিদ্যায় আধুনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তিন মাসের কিছু বেশী সময় (একশ দিন) এই সংস্কার প্রচেষ্টা চালু ছিল।

বক্সার বিদ্রোহ—ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া : কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ও রক্ষণশীল মহলের বিরোধিতায় সম্রাটের এই সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিধবা সম্রাজ্ঞী জুসির নেতৃত্বে রাজদরবারের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ

সম্রাটকে তাঁর নির্দেশসমূহ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন। এর পরেই জুসি রাজবংশ বিরোধী আন্দোলনের গতি বিদেশীদের বিরুদ্ধে চালু করেন। কতকগুলি গুপ্তসমিতি বিদেশীদের এবং স্থানীয় খ্রীষ্টানদের আক্রমণ করতে শুরু করল। এই সমস্ত সমিতির মধ্যে প্রধান ছিল মুষ্টি-যোদ্ধা সমিতি। তাদের বিদ্রোহ 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী পিকিং ও অন্যান্য শহরে বিদেশীদের উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং অনেক বিদেশী হতাহত হয়। সরকারী সৈন্যদলও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশেষে এক আন্তর্জাতিক সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করে। এই ব্যর্থ বিদ্রোহের ফলে চীনের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ল।

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১৯০২—১৯০৮ খ্রীঃ)ঃ বক্সার বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে চীনের সকল শ্রেণীর লোকই উপলব্ধি করল যে যুগোপযোগী সংস্কার প্রবর্তন ব্যতীত দেশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কোন উপায় নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলে সংস্কারপন্থী দল আরও শক্তিশালী হলো। ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী জুসি বুঝতে পারলেন যে এদের দাবি না মানলে মাঞ্চু রাজবংশের অস্তিত্ব রাখা যাবে না। তাঁর নির্দেশে এক সংস্কারমূলক কর্মপন্থা গৃহীত হলো। পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল করা হলো এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ব্যবস্থা হলো। শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলো এবং সৈন্যদলকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষাদান করা হলো। পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একদল প্রতিনিধিকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং চীনের তরুণগণকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১ খ্রীঃ)ঃ চীনাবাসীরা এই সময় মাঞ্চুরাজবংশের শাসনের বিলোপ সাধন করার জন্য দাবি জানাল। কারণ, তাদের মতে এই অক্ষম রাজবংশই ছিল চীনের সমস্ত লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। সম্রাজ্ঞী জুসির জীবিতকাল পর্যন্ত রাজবংশ কোন প্রকারে

আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পরে এক নাবালক চীনের সিংহাসনে আরোহণ করলে মাঞ্চু রাজবংশের পতন আসন্ন হয়ে পড়ল। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি ঘটে।

প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২খ্রীঃ)—সান-ইয়াৎ-সেন ও ইউ-য়ান-সিকাই ঃ এইসময় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। সান-ইয়াৎ-সেন এবং তার অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্ত। তাঁর গণতান্ত্রিক মতবাদের জন্য সান চীন থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং বিদেশ থেকে আন্দোলনের পরিচালনা করেছিলেন।

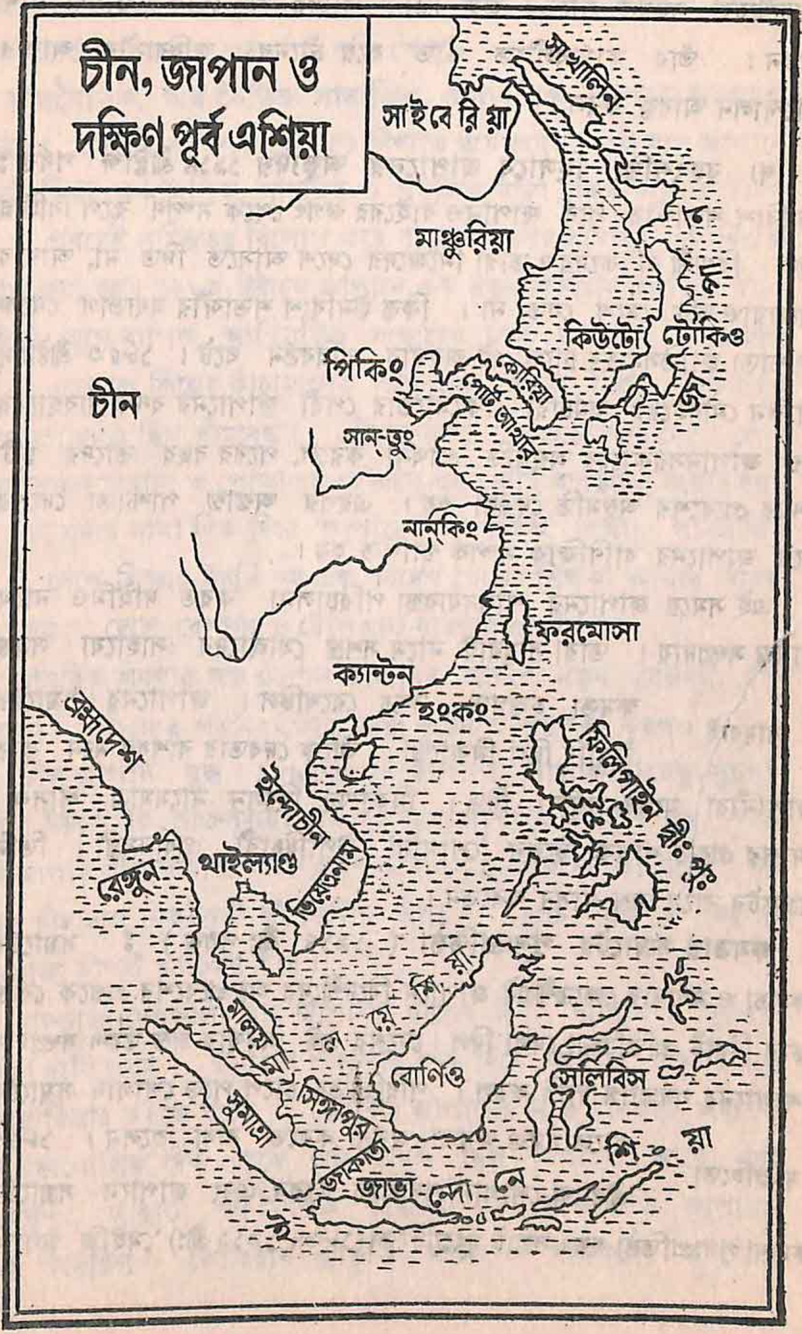
সান্‌-ইয়াৎ-সেন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুয়োমিন্‌ তাঙবা জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন। এই দলের কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টন ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চল। বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে চীন সরকার দেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারিগণ অত্যাচারী মাঞ্চু রাজবংশের সঙ্গে কোন প্রকার আপস মীমাংসায় আসতে রাজী হলেন না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিপ্লবীগণ নান্‌কিং শহর অধিকার করে এবং তথায় এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। সান্‌-ইয়াৎ-সেন নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন (১৯১১ খ্রীঃ)।



সান্‌-ইয়াৎ-সেন

কিন্তু আদর্শবাদী সান্‌-ইয়াৎ-সেন নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের সংহতির জন্য ইউ-য়ান-সিকাই নামে একজন প্রবীণ সেনাপতির অনুকূলে পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইউ-য়ানের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা।


চীন, জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
সাইবেরিয়া
সাখালিন
মাঞ্চুরিয়া
কিউটো
টোকিও
পিকিং
কোরিয়া
পোর্ট আর্থার
চীন
সান-তুং
নানকিং
ফরমোসা
ক্যান্টন
হংকং
ব্রহ্মদেশ
ইন্দোচীন
থাইল্যাণ্ড
রেঙ্গুন
ভিয়েতনাম
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
মালয়
মা ল য়ে শি য়া
বোর্ণিও
সেলিবিস
সুমাত্রা
সিঙ্গাপুর
জাকার্তা
জাভা
ই ন্দো নে শি য়া

বিদেশীদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা দান করেন। তাঁর কার্যাবলীতে ভীত হয়ে চীনের অধিবাসীরা আবার আন্দোলন আরম্ভ করল।

(খ) বৃহৎশক্তি হিসাবে জাপানের অভ্যুদয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত : উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে জাপানও বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিদেশী বণিকদেরও তারা নিজেদের দেশে আসতে দিত না, আবার নিজেরাও অন্য দেশে যেত না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চাপে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন নৌবহরের কর্মচারী কমোডোর পেরী জাপানের বন্দর ব্যবহারের জন্য জাপানসরকারের অনুমতি প্রার্থনা করলে, পরের বছর তাদের দুটি বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই সময়ে জাপানের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত দাইমিও নামে সামন্ত সম্প্রদায়। তারা সামুরাই নামে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাহায্যে সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে রেখেছিল। জাপানের সম্রাটের উপাধি ছিল মিকাডো। তাঁকে দেবতার বংশধর মনে করে জাপানীরা যথেষ্ট মর্যাদা দিত। মিকাডো ছিলেন নামেমাত্র শাসক। দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন 'শোগান' উপাধিধারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি সম্রাটের নামে দেশ শাসন করতেন।

সামুরাই

ক্ষমতায় সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত) : সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রেশীঘ্রই জাপানে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দেশের এই অবস্থার জন্য তরুণ সম্প্রদায় শোগানের পদত্যাগ দাবি করল। পরিস্থিতির চাপে পড়ে শোগান সম্রাটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শোগান পদত্যাগ করেন এবং জাপানে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। সম্রাট মুৎসুহিতো (১৮৬৭-১৯১২ খ্রীঃ) 'মেইজি' উপাধি

মুৎসুহিতো

ধারণ করেন। এইভাবে জাপানের ইতিহাসে শুরু হল 'মেইজি যুগ'। মেইজি যুগে সম্রাটের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পাশ্চাত্য কারণ ঃ মেইজি যুগ সংস্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এই যুগে জাপানে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও সামজিক নানা বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি হয়। প্রথমেই সামন্ততন্ত্র বিলোপ করে সামুরাই শ্রেণীর সামরিক একাধিপত্য লোপ করা হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। মেইজি যুগে ব্যাপক অর্থ নৈতিক সংস্কারের ফলে জাপানে শিল্পোন্নতি হয়। এতকাল শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনে স্বল্পতা ছিল। জাপানের খাদ্যোৎপাদনও ছিল সীমাবদ্ধ। এইবার জাপান এদিকে নজর দেয়। দেশে জাহাজের কারখানা ও পোতাশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমি ব্যবস্থারও সংস্কার হয়।

এই সময়ে নানা দিক দিয়ে জাপানের সামাজিক সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। দেশে শিক্ষার উন্নতি হয় এবং বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার ব্যবস্থা করা হয়। দেশে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

সামরিক অবস্থার জন্য জাপান জার্মানির আদর্শে নতুন সৈন্যদল গঠন করলো। নৌ-বহর গঠনের ক্ষেত্রে তারা বৃটেনকে অনুকরণ করল।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫)—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা ঃ প্রাচ্যে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের, বিশেষ করে রাশিয়ার অগ্রগতি বন্ধ করার জন্য জাপান সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। প্রথমেই জাপানের দৃষ্টি পড়ল চীন এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলির উপর। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ফরমোজা দ্বীপটি আক্রমণ করে।

পাশ্চাত্য দেশগুলির মত জাপানও চীনের উপর বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দাবি করল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জাপান কোরিয়াতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কোরিয়া জাপানের অতি নিকটে অবস্থিত বলে ভৌগোলিক দিক থেকে এই স্থানটি ছিল জাপানের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া অর্থ নৈতিক কারণেও কোরিয়ার প্রতি জাপানের নজর পড়েছিল। কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ও খাদ্যসম্ভার জাপানের

প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। এই সময়ে কোরিয়া ছিল নামেমাত্র চীনের অধীন। রাশিয়া যদি কোরিয়াতে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে অগ্রসর হয় তাহলে জাপানের কাছে হবে সেটা বিপদের কারণ। এইসব নানা কারণে কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাপান ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে জাপানীরা অতি সহজেই জয়লাভ করে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিমেনোসেকির সন্ধি অনুযায়ী চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং ফরমোজা দ্বীপ, পেস্কাডোর্স দ্বীপপুঞ্জ এবং পোর্ট-আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু জাপান বেশীদিন এই সন্ধির ফল ভোগ করতে পারেনি। রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি করলে জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটাং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের বিরোধের সূচনা হয়।

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (১৯০২ খ্রীঃ) : রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের বিরোধের অন্যান্য কারণও ছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করে এবং বন্দরটি অধিকার করে। এরপর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করে। রাশিয়ার এই আগ্রাসী নীতিতে ভীত হয়ে জাপান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তি করে। এই মিত্রতার ফলে স্থির হলো ইংরাজরা কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব মেনে নেবে এবং জাপানও চীনে ইংরাজদের স্বার্থ স্বীকার করে নেবে। এই মৈত্রী প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানি শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায় হলো।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫ খ্রীঃ)। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর ফলেও রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করেনি। অবস্থানের দিক থেকে মাঞ্চুরিয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সুতরাং এ জায়গায় রাশিয়ার ঘাঁটি হউক সেটা জাপান মোটেই চায়নি। ইতিপূর্বে রাশিয়ার চাপ-সৃষ্টিতেই জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল

এইসব নানা কারণে জাপান ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ট সমাউথের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটং উপদ্বীপ জাপানকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়। শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশেও জাপানের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাপানের মর্যাদা বেড়ে গেল। রাশিয়ার মত এত বড় একটি দেশকে হারিয়ে দিয়ে জাপান আরও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। এরপর জাপান কোরিয়া দখল করে (১৯১০ খ্রীঃ)।

কোরিয়া দখল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং চীনের উপর জাপানের ২১ দফা দাবিঃ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় বৃহৎ শক্তিবর্গ ইউরোপে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে জাপান দুর্বল চীনের কাছে ২১ দফা দাবি উত্থাপন করে। মিত্রপক্ষে যোগদান করে জাপান চীনের শাণ্টুং প্রদেশ এবং সেখানকার জার্মান প্রভাবাধীন জায়গাগুলি দাবি করে। চীনে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক অধিকারও ছিল জাপানের দাবিগুলির অন্যতম। জাপান আরও দাবি করল যে চীনের রাজদরবারে জাপানের পরামর্শদাতা রাখতে হবে। ভার্সাই সম্মেলনে (১৯১৯ খ্রীঃ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিবর্গ চীনের বিরুদ্ধে জাপানের ২১ দফা দাবি সমর্থন করে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীতে জাপান পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

কালপঞ্জী

অহিফেন যুদ্ধ	১৮৩৯ খ্রীঃ
নানকিং-এর সন্ধি	১৮৪২ খ্রীঃ
টিয়েনসিনের সন্ধি	১৮৫৮ খ্রীঃ
চীন-জাপান যুদ্ধ	১৮৯৪—৯৫ খ্রীঃ
তাইপিং বিদ্রোহ	১৮৫৩ খ্রীঃ
প্রজাতান্ত্রিক চীন	১৯১২ খ্রীঃ
জাপান সম্রাট মুৎমুহিতো	১৮৬৭—১৯১২ খ্রীঃ
ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী	১৯০২ খ্রীঃ
রুশ জাপান যুদ্ধ	১৯০৪—১৯০৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯ নম্বর**

১। চীনের অহিফেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
২। চীনে বিদেশীদের বসতি বিস্তার সম্পর্কে কি জান ?
৩। তাইপিং বিদ্রোহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। বক্সার বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান ?
৫। মেইজি যুগে জাপানে কিভাবে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?
৬। মেইজি যুগে জাপানের সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।
৭। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৮। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩ নম্বর**

১। টিয়েনসিনের সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ কর।
২। হের উন্মুক্ত দ্বার নীতি বলতে কি জান ?
৩। চীনের একশ দিনের সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
৪। চীনের বিধবা সম্রাজ্ঞী জুসির সংস্কারগুলি উল্লেখ কর।
৫। প্রজাতান্ত্রিক চীন গঠনে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।
৬। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী সম্পর্কে কি জান ?
৭। চীনের উপর জাপানের ২১ দফা দাবির প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ কর।

মৌখিক প্রশ্ন * * * **এক নম্বর**

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী— —চীনের উন্মুক্ত দ্বার নীতি ঘোষণা করেছিলেন।

(খ) তাইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন——।

(গ) চীনের ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর নাম ছিল——।

(ঘ) প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হলেন——

(ঙ) জাপানের সম্রাটের উপাধি ছিল——।

(চ) ——এর সন্ধির দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

অধ্যায়

এগারো

ব্রিটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ
(১৮৫৮-১৯১৪ খ্রীঃ)

নতুন শাসন ব্যবস্থা ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট এক আইন তৈরী করে ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করেন। ঐ বছর ১লা নভেম্বর লর্ড ক্যানিং মহারানীর নামে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন।

মহারানী ভিক্টোরিয়া

এই ঘোষণায় বলা হয় যে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যে সব সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে তা তিনি মেনে চলবেন। রাজন্যবর্গের বৃত্তি, সম্মান ও গৌরব বর্ধিত হবে। ধর্মে উদার ভাব ও বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে। উপযুক্ত বিবেচনায় ভারতবাসীদেরও রাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন ঘটল। কোম্পানীর রাজত্বেরও সমাপ্তি হল। নতুন আইনে স্থির হল যে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ভারত সচিব নামে ভারত শাসন বিষয়ক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণর জেনারেল এখন থেকে 'ভাইসরয়' নামে পরিচিত হবেন। লর্ড ক্যানিং হলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়।

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ ভাইসরয়দের আমলে কিছু কিছু রাজ্যবিস্তার হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ভাইসরয়ই রাজ্যজয় অপেক্ষা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য পররাষ্ট্রনীতির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্যার

লর্ড লিটন

লরেন্সের আমলে ভুটানের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয় (১৮৬৬ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ভুটানীরা পরাজিত হলে বাংলার সীমান্তবর্তী ডুয়ার্স অঞ্চলটি ইংরাজদের অধীনে এল। লর্ড লিটনের আমলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮ খ্রীঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পূর্ববর্তী

ভাইসরয়দের আমলে আফগানিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু লিটন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আফগানরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং লর্ড রিপনের আমলে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৮৫-১৮৮৬ খ্রীঃ) সংঘটিত হয় এবং ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বিতীয় এলগিনের আমলে (১৮৯৪-১৮৯৯ খ্রীঃ) সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল অধিকৃত হয়। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) আফগানিস্তান, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং তিব্বতে ইংরাজ সরকারের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

বৃটিশ ভারতের বিস্তার

তাঁর আমলে কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বতে এক অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং এর ফলে লাসা অধিকৃত হয়। কার্জনের পররাষ্ট্র নীতির ফলে ঐসব স্থানে বৃটিশ কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে।

লর্ড কার্জন

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার : ইংরাজ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়া বহু সমাজ-সংস্কারও হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতীয়গণ প্রচলিত রীতি-নীতি ও গোঁড়ামি নির্বিচারে মানতে রাজী হলেন না। এই শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং লর্ড ডালহৌসীর আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভাইসরয়দের আমলেও বহু সমাজ-সংস্কার হয়েছিল। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার একটি নিবিড় যোগ রয়েছে। ধর্ম বিষয়ে যুক্তিবাদী হয়েই এক সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরই নাম অনুসরণ করে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের উদ্যোগে এই সমাজ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক কাথিয়াবাড়ে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ইংরাজশাসকগণও আইন প্রণয়ন করে সমাজ সংস্কারকদের নানা ভাবে সাহায্য করলেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশীয় বিবাহ বিধি' আইন পাশ করাতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই আইনে বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধ হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর বিবাহকালে যথাক্রমে আঠার বছর ও চৌদ্দ বছর নির্ধারিত হয়। স্ত্রী-জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা ব্রহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক উন্নতিবিধান প্রার্থনা সমাজের অন্যান্য কীর্তি। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে এবং সাধারণ শিক্ষার উন্নতিকল্পে লর্ড রিপন ও লর্ড কার্জন বহু আইন প্রণয়ন করেছিলেন।



রাজা রামমোহন রায়

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ: ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক ছলনাকে ভিত্তি করে। এর পেছনে জনগণের কোন শুভেচ্ছা বা সমর্থন ছিল না। প্রথমদিকে এই শক্তির বিরোধিতা করে দেশীয় রাজন্যবর্গ। পরবর্তী স্তরে সিপাহী বিদ্রোহ ওয়াহেবী আন্দোলন ইত্যাদি বিপ্লবাত্মক বিরোধিতা শুরু হয়। তৃতীয় পর্যায়ে এই বিরোধিতা শুরু করেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়

জনগণ। তাঁদের মনে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ইত্যাদি তীব্র আবেগগুলিই অবশেষে জাতীয়তাবাদের প্রসার সম্ভব করে তোলে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল। **বার্ক, মিল, মেকলে বেন্থাম** প্রভৃতি মনীষীগণ লেখনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বাধীনতালাভের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয়েরা প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে। কিন্তু সেই শিক্ষার মধ্য দিয়েই রাজা রামমোহন রায়ের মত মানুষ উপলব্ধি করেন ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। দেশ ও দেশবাসীর অগ্রগতির জন্য তিনি ভারতীয়দের ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারক ও চিন্তানায়কগণ ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ছিলেন ঘোর জাতীয়তাবাদী। তাঁর বাণী ও রচনা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা জোগায়। জাতীয়তাবোধের জাগরণের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক প্রভৃতি দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তারে বাংলা সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম। এইগুলি বৃটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করে। লর্ড লিটন আইন করে দেশীয়



স্বামী বিবেকানন্দ

সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দিলে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকা'। ক্রমে ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জন্মলাভ করে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক সর্বভারতীয় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু এর আগে থেকেই ভারতীয়দের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত হয় 'ভারত সভা'। তাঁর উদ্যোগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় সভা আহূত হয়। এই জাতীয় সভাই জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি সূচনা করে। এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। প্রথম অধিবেশনে বাহাত্তর জন প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাংলার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাষণ দান কালে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল—(১) ভারতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা ; (২) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ দূর করা; (৩) সমসাময়িক কালের সামাজিক সমস্যা ও ঐগুলির সমাধানের জন্য দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা ; (৪) পরবর্তী এক বছর কাল ধরে জনসাধারণের স্বার্থে কিভাবে জাতীয় কংগ্রেস কাজ করতে পারে তা নির্ধারণ করা।

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং দাদাভাই নৌরজী ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। এরপর থেকে কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয় জনগণের


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কোন না কোন শহরে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। গভর্ণর জেনারেল ডাফরিন প্রথম দিকে জাতীয় কংগ্রেস গঠনে হিউমকে প্ররোচিত করলেও, তিনি কিছুদিন পর তার বিরোধিতা করতে লাগলেন।

বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামতি গোখলে প্রভৃতি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে তাঁদের দাবি আদায় করবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের বলা হত 'নরমপন্থী'। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কতিপয় নেতা যেমন—বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপৎ রায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিদেশীয় ইংরাজ সরকারের

কাছ থেকে সহজ পন্থা অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন ও অনুরোধ-উপরোধের মাধ্যমে দাবি আদায় করা সম্ভব হবে না। তাঁরা বিলাতী দ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং স্বরাজকে দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তারা 'চরমপন্থী' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আদর্শ নরমপন্থীদের মনঃপুত না হওয়ায় আন্দোলনের কর্মসূচী ও কর্মপন্থা নিয়ে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সেই সময় ভারতের যুব সম্প্রদায় ও দেশের সাধারণ মানুষ চরমপন্থী-দের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৬-১৯১৪খ্রীঃ)ঃ ভারতীয় চরমপন্থী নেতাদের অগ্রগণ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা



লালা লাজপৎ রায়



বিপিনচন্দ্র পাল

লাজপৎ রায় এবং অরবিন্দ ঘোষ। প্রথমোক্ত তিনজন লাল-বাল-পাল নামে খ্যাত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট অধিবেশনে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান।

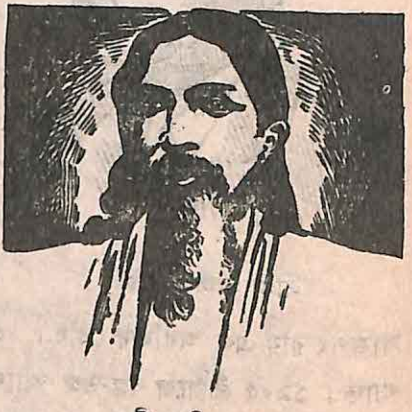
বিপিনচন্দ্র তাঁর চরমপন্থী মতবাদের আদর্শে দেশবাসী বিশেষতঃ দেশের

যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ভারতের এক প্রান্তথেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি যে কোন মূল্যে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার কথা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিবাদ বৃটিশ সরকার অগ্রাহ্য করলে বিপিনচন্দ্রের ইংরাজদের প্রতি ঘৃণা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে ইংরাজ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অসহযোগ ও তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল

ভারতের জাতীয়তা এবং চরমপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব **শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ**। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার বাঙালীকে দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দেশসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। সেই সময় তিনি বরোদায় অধ্যাপনার কার্যে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাংলায় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, অরবিন্দ ঘোষ প্রথম তার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় সেইসময়ে প্রকাশিত বন্দেমাতরম্ পত্রিকা দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। এই পত্রিকায়ই অরবিন্দ ঘোষ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অরবিন্দ বাংলাদেশের বিপ্লবী সমিতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এমন কি, তিনিই সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের মন্ত্রণাগুরু। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তর

অরবিন্দ ঘোষ



শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

দলের দুই বিপ্লবী, ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কুখ্যাত বিচারক কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। ঐ সূত্রে ঐ বছরই কলিকাতার মুরারীপুকুরের এক বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করল পুলিশ। বহুজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দও গ্রেপ্তার হলেন। এই মামলা আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলা পরিচালনা করে অরবিন্দকে মুক্ত করলেন, কিন্তু অন্যান্য ১৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হল।

একই সময়ে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠা ও কেশরী নামক দুটি পত্রিকার মাধ্যমে আগুন ছড়াচ্ছিলেন এবং কিভাবে দেশবাসী স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবে সেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি বলতেন, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার, তা আমি অর্জন করবই।" বাল-গঙ্গাধর তিলক দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে 'গণপতি' ও 'শিবাজী উৎসবের' প্রচলন করেছিলেন। তিলকের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত

বাল গঙ্গাধর তিলক

হয়ে মহারাষ্ট্রের বহু তরুণ স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে অনু-প্রাণিত হয়েছিল। বিপ্লবী প্রচারকার্য চালাবার অভিযোগে তিলককে ইংরাজ সরকার গ্রেপ্তার করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পরে তিলক বেশান্তের সঙ্গে হোমরুল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন।


বালগঙ্গাধর তিলক

চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম প্রধান ছিলেন পাঞ্জাবের **লালা লাজপৎ রায়**। তিনি পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের যুবসম্প্রদায়কে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ অন্দোলনের সময় বাংলার নেতৃবর্গ বর্জন নীতি, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার যে কর্মসূচী

গ্রহণ করেছিলেন, লালা লাজপৎ রায় তাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। লালা লাজপৎ রায়ের প্রচারকার্য ইংরাজ সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে সরকার রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে। কিছুদিনের জন্য তাঁকে মান্দালয়ে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা লালা লাজপৎ রায়ের সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করেছিল।

লালা লাজপৎ রায়

কালপঞ্জী

মহারাণীর ঘোষণাপত্র	১৮৫৭ খ্রীঃ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ	১৮৭৮—১৮৮১ খ্রীঃ
তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ	১৮৮৫—১৮৮৬ খ্রীঃ
প্রথম আদমশুমারি	১৮৮১ খ্রীঃ
ভারত সভার প্রতিষ্ঠা	১৮৭৬ খ্রীঃ
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা	১৮৮৫ খ্রীঃ
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫ খ্রীঃ
কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন	১৯০৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯নম্বর

১। ভাইসরয়দের অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি বিবরণ দাও।
২। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।
৩। কিভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটেছিল ?
৪। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপের একটি বিবরণ দাও।
৫। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৩ নম্বর**

১। ভারতের নতুন শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উল্লেখ কর।

২। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।

৩। জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। নরমপন্থী ও চরমপন্থী কাদের বলা হত এবং কেন?

৫। চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের অবদান উল্লেখ কর।

৬। লালা লাজপৎ রায়ের সংগ্রামী কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **১ নম্বর**

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে √ চিহ্নটি দাও :**

(ক) তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়েছিল **লর্ড লিটনের/লর্ড ডাফরিনের** আমলে।

(খ) বঙ্গ-ভঙ্গ হয়েছিল **লর্ড কাজনের/ লর্ড রিপনের** আমলে।

(গ) ভারতসভা স্থাপন করেন **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রামমোহন রায়**।

(ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন **এ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম/ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**।

(ঙ) 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' এই কথা বলেছেন **লালা লাজপত রায়/বাল গঙ্গাধর তিলক**।

অধ্যায়

বারো

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এর পূর্বেও আমরা বহু যুদ্ধের বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু এই যুদ্ধ ব্যাপকতা ও ধ্বংসের দিক থেকে পূর্বেকার সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বের অনেক দেশই কোন না কোন ভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই এই যুদ্ধকে বলা হয় বিশ্বযুদ্ধ।

কারণসমূহ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফল।

প্রথমতঃ, শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে শিল্প ও কলকারখানার উন্নতি হয়েছিল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ক্রমে মারণাস্ত্র প্রস্তুতের কারখানাও গড়ে উঠেছিল। মারণাস্ত্রের প্রাচুর্যের ফলে মানুষ স্বভাবতঃই যুদ্ধকামী হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল। প্রত্যেক দেশ ও জাতিই অন্যান্য দেশ ও জাতি অপেক্ষা নিজেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। ফলে দেশে দেশে পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষের মনোভাব জেগে উঠেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অপরাপর দেশকে পদানত করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

তৃতীয়তঃ, জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজ দেশকে পৃথিবীর শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এতে পৃথিবীর সর্বত্র এক ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। তা'ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানির তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক জার্মানির নিরাপত্তা

ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ত্রি-শক্তির মৈত্রী গড়ে তোলেন। এর উত্তরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া 'ত্রিশক্তির আঁতাত' গঠন করে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ দুটি বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থতঃ, বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে গ্রাস করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সার্বিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত থাকায় সার্বিয়ার উপর অস্ট্রিয়া আক্রমণ চালালে রাশিয়ার নিরপেক্ষ থাকার কোন প্রশ্ন ছিল না। রাশিয়া স্লাভরাষ্ট্র সার্বিয়ার স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

পঞ্চমতঃ, এই সময়ে ম্যাসিডনিয়ার অধিকার নিয়েও গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

উপরিউক্ত নানা কারণে ইউরোপের সর্বত্র যখন এক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদ্যমান, সেই সময়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন তারিখে অকস্মাৎ অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ড বস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজেভো নামক স্থানে নিহত হন। ফার্ডিনাণ্ড ছিলেন অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার উপর এই হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় দায়িত্ব আরোপ করে। এক চরমপত্রে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার নিকট কয়েকটি দাবি জানিয়ে চাপ সৃষ্টি করে। সার্বিয়া ঐ সব দাবি মানতে অস্বীকৃত হলে অস্ট্রিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই সার্বিয়া আক্রমণ করে এবং এর ফলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

যুদ্ধের ব্যাপকতা ঃ প্রথমবিশ্বযুদ্ধে জার্মানি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেন যোগ দেয় সার্বিয়ার পক্ষে। এই যুদ্ধে যুদ্ধমান রাষ্ট্রগুলি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার নতুন নতুন শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের কার্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করেছিল এবং এর জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে প্রতি দেশেই উন্নত ধরনের বিমান, সাবমেরিন, কামান,

বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও শত্রুর উপর নিক্ষেপ করবার জন্য নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত হল এবং যুদ্ধস্থলে এইসব ভয়াবহ অস্ত্র ও গ্যাস ব্যবহার করা হল। পূর্বেকার যে কোন যুদ্ধের চাইতে এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশী। জলে, স্থলে ও আকাশে চার বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। শেষ পর্যন্ত জার্মান সরকার যুদ্ধাবসান স্থির করলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর এই যুদ্ধ শেষ হয়।

ফলাফল ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় এককোটি ৩০ লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল, প্রায় ৭০ লক্ষ সৈনিক পঙ্গু হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল ২ কোটির উপর। কিন্তু এর চেয়েও অধিক সংখ্যক বেসামরিক লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একেবারে হ্রাস পেয়েছিল।

খরচের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই যুদ্ধে মোট খরচ হয়েছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। এ থেকেই অনুমান করা যায় মানুষের প্রাণ-নাশের জন্য কি পরিমাণে জিনিস কাজে লাগানো হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দেয়।

এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং জার্মানি এই চারটি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এর ফলে অনেক নতুন নতুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং ইউরোপের মানচিত্রের চেহারা একেবারেই পাল্টে যায়। এই যুদ্ধের ফলেই ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে।

যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষের মনে শান্তি-স্পৃহা জেগে উঠে। কিছুদিনের মধ্যেই গঠিত হয় 'লীগ অফ নেশন্‌স্‌' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

সালপঞ্জী

সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড	২৮ শে জুন, ১৯১৪ খ্রীঃ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা	২৮ শে জুলাই, ১৯১৪ খ্রীঃ
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি	১১ই নভেম্বর, ১৯১৮খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ **৯নম্বর**

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ কর।

নির্দেশক প্রশ্ন ✽ ✽ ✽ ✽ **তিন নম্বর**

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা উল্লেখ, কর।

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ---------------- **এক নম্বর**

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট ছিলেন ——।

(খ) ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র —— বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো শহরে নিহত হন।

(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল —— তারিখে।

(ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় —— তারিখে।

(ঙ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় —— সৈনিক পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

তেরো

রুশ বিপ্লব

ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রাশিয়ার বিপ্লবও পৃথিবীর ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের বাণী ছিল যেমন স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, তেমনি রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী ছিল সমাজতন্ত্র।

কারণ: বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কারণের সমষ্টিগত ফল হিসেবেই রাশিয়ার বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার তদানীন্তন জারতন্ত্রের নানাপ্রকার দোষত্রুটি এবং শাসনকার্যের অক্ষমতাকে দায়ী করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জার (রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হয়) দ্বিতীয় নিকোলাসের আমল থেকেই বিশেষভাবে রাশিয়ার জারতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাঁর অকর্মণ্যতার ফলে দেশে যেমন দেখা দিয়েছিল অরাজকতা তেমনি ভাবে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাশিয়ার দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু জার নিকোলাস নিজ অকর্মণ্যতা হেতু স্ত্রী আলেকজান্দ্রার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিলেন। আবার সাইবেরিয়াবাসী যাজক রাসপুটিন দ্বিতীয় নিকোলাস এবং রাণী আলেকজান্দ্রার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। রাসপুটিনের নির্দেশেই সেই সময়ে শাসনকার্য পরিচালিত হতো। এমতাবস্থায় দেশের শাসনকার্যে অরাজকতার জন্য রাসপুটিনকে দায়ী করে রাশিয়ার এক সন্ত্রাসবাদী দল তাঁকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় নিকোলাস

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে, জার নিকোলাস বাধ্য হয়ে 'ডুমা' নামক এক জাতীয় সভা আহ্বান করলেন। এই জাতীয় সভায় নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের সাহায্য নিয়ে তিনি অবশ্য তাঁর স্বৈরাচারী নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন। কারণ নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন স্বৈরাচারী শাসনের সমর্থক। বলা বাহুল্য ডুমার

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। ডুমায় সেই সময়ে অবশ্য সরকার-বিরোধী একটি দলও ছিল। এদের 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক' পার্টি বলা হয়। এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠকে বলা হতো 'বলশেভিক' এবং সংখ্যালঘিষ্ঠকে বলা হতো 'মেনশেভিক' দল।

রাশিয়ার জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও ছিল বর্ণনাতীত। রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না। সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক লোক ছিল, কৃষক অথবা শ্রমিক এবং এক হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কৃষকগণ তাদের চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তিলাভের আশায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের ফলে কৃষকগণ তাদের জমি ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার ফলে কৃষকগণ জমি বিক্রয় করে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল।

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা কোনভাবেই উন্নত ছিল না। উপরন্তু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মাদক দ্রব্য পান করে কৃষক-শ্রমিকগণ সমাজ-জীবনের এক নিম্নতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সেই সময় রুশ 'দার্শনিকগণ' তাঁদের রচনার মাধ্যমে রুশ জাতির মধ্যে সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেতনা ও সাহস জাগিয়ে তোলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধও রাশিয়ার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। জার্মানির পরাজয় রুশবাসীদের কাছে এটা প্রমাণ করেছিল যে, জারতন্ত্রের অত্যাচার এবং অকর্মণ্যতার ফলেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার দুর্বলতা প্রকটিত হয়েছে স্বভাবতঃই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশবাসীদের মন বিষিয়ে গিয়েছিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। পেট্রোগ্রাড শহরের শ্রমিকগণ এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু ক'রে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে থাকে। সেই সময়ে রাশিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে ক্রমে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জার নিকোলাস

সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সামরিক বাহিনী ধর্মঘটীদের দমন করা দূরে থাকুক, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সমস্ত দেশে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি করল। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে অসহায় নিকোলাস পদত্যাগ করলেন। রাশিয়ায় এক সাধারণতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেরেন্‌স্কির নেতৃত্বে গঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশের মানুষের কতকগুলি স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত তা সম্ভবপর হয়নি। ফলে কার্ল মার্কসের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে লেনিন

লেনিন

ও ট্রটস্কির নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর লেনিন ও ট্রটস্কি রাশিয়ার বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। বলশেভিক সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার বিপ্লবকে স্থায়ী করা, বৈদেশিক যুগের অবসান ঘটানো এবং কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদকে রাশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগিতায় বলশেভিক সরকার বৈদেশিক যুদ্ধ থেকে দেশের নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ হয়েছিল এবং রাশিয়ায় বিপ্লব স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।



লেনিন

ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের উপর রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ

প্রথম থেকেই নতুন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুর অন্ত ছিল না। বলশেভিকরা জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করেছিল। কিন্তু ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জাপান এবং আমেরিকা বলশেভিকদের এই কার্যে সন্তুষ্ট হয়নি। রাশিয়া থেকে সমস্ত ইউরোপে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম্‌ ছড়িয়ে পড়তে পারে—এই আশঙ্কায় মিত্র শক্তিবর্গ রাশিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত

করে। চোদ্দটি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লব -বিরোধীরাও বিদ্রোহ করে। এই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহামারীতেও বহু লোক প্রাণ দেয়।

বহিশত্রুর আক্রমণ, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিদ্রোহ এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত থেকে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সহজ ছিল না। বিদ্রোহীদের মধ্যে মিল ছিল না। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিও নানা কারণে যুদ্ধ চালাতে অনিচ্ছুক ছিল। অপরদিকে বলশেভিকরা লেনিন, ট্রট্স্কি, স্ট্যালিন প্রভৃতি শক্তিশালী নেতৃবর্গের দ্বারা চালিত হয়ে শত্রুদের পরাজিত করে। বিদেশী শক্তিগুলি রাশিয়া থেকে সৈন্য অপসারিত করে। বিদ্রোহী সেনাপতিগণ একে একে পরাজিত হয়। বলশেভিকরা তাদের নতুন রাষ্ট্রকে বাইরের এবং ভিতরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্যে রাশিয়া আক্রমণ করে। আবার রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়, কিন্তু বলশেভিকরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে। পোল্যাণ্ডও পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নিরাপদ করতে সক্ষম হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়। অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রও কালক্রমে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে মেনে নেয়।

তবে ইউরোপের দেশগুলিতে সাম্যবাদের আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু চীনে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করায় সেখানে মার্কসবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। রাশিয়ায় যে শোষণহীন সমাজ স্থাপিত হয়েছে, তা ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু রুশ বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও সাফল্য ভারতে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

কালপঞ্জী

জার দ্বিতীয় নিকোলাস	১৮৯৪—১৯১৭ খ্রীঃ
লেনিন	১৮৭০—১৯২৪ খ্রীঃ
কৃষক বিদ্রোহ	১৯০৫ খ্রীঃ
বলশেভিক বিপ্লব	(নভেম্বর) ১৯১৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৯নম্বর**

১ রুশ বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর।

২। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * **৩নম্বর**

১। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান ?

২। ডুমা কি ?

৩। বলশেভিক দলের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান ?

৪। লেনিন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ---------------------- **এক নম্বর**

১। **এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) রাশিয়ায় বিপ্লবের বাণী কি ছিল ?

(খ) রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সম্রাট কে ছিলেন ?

(গ) রাসপুটিন কে ?

(ঘ) কেরেনস্কি কে ছিলেন ?

(ঙ) রাশিয়ায় কবে বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ?

অধ্যায়

চৌদ্দ

ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীঃ)

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন : জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এক সম্মেলন আহ্বান করে। মোট ৩২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের কার্য পরিচালনার জন্য ৫টি রাষ্ট্রের (যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান) ১০ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হল। কিন্তু সম্মেলনের প্রকৃত পরিচালক ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনস্যু এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যাণ্ডো। ক্লিমেনস্যু ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি।

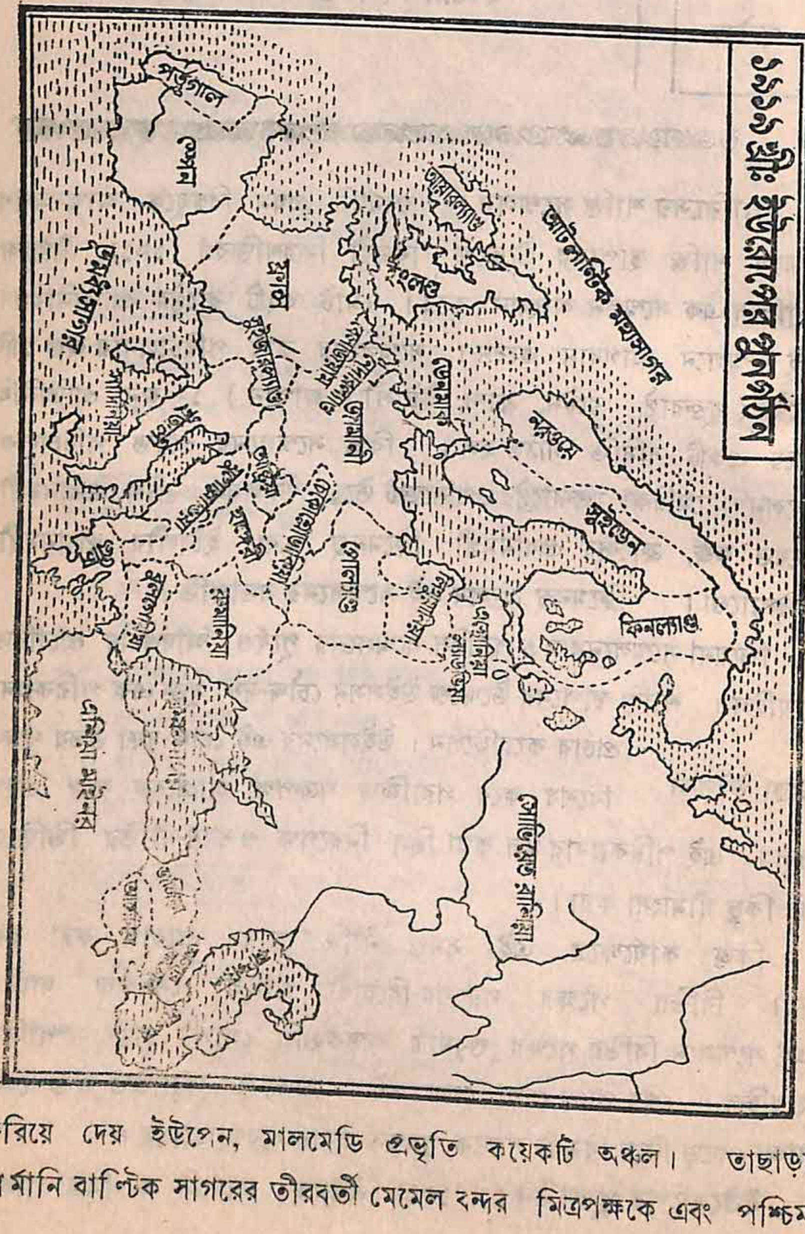
উড্রো উইলসন

ভিয়েনা সম্মেলনের মত প্যারিস সম্মেলনের পূর্বেও আদর্শবাদ প্রচারিত হয়েছিল। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উইলসন চৌদ্দ-দফা যুক্ত এক পরিকল্পনা প্রচার করেছিলেন। উইলসনের এই চৌদ্দ-দফা উভয় পক্ষ-বিশেষ করে পরাজিত শত্রুপক্ষ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করল। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল নিরপেক্ষ ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সব কিছু মীমাংসা করা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সমস্ত নীতি আর প্রয়োগ করা হল না। বিভিন্ন পক্ষের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থই সেইজন্য দায়ী। এই সম্মেলনে বিভিন্ন পক্ষের শুধুমাত্র কতকগুলি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই সম্মেলনেও পরাজিত শত্রুপক্ষের রাজ্য কেড়ে নিয়ে বিজয়ী পক্ষকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

ইউরোপের পুনর্গঠন : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও মিত্র পক্ষের

মধ্যে ভার্সাই সন্ধি সম্পাদিত হয়। এই সন্ধি চুক্তির ফলে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসেস ও লোরেন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। জার্মানি বেলজিয়ামকে



১৯১৯ খ্রীঃ ইউরোপের পুনর্গঠন

ফিরিয়ে দেয় ইউপেন, মালমেডি প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল। তাছাড়া জার্মানি বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী মেমেল বন্দর মিত্রপক্ষকে এবং পশ্চিম

প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে অর্পণ করতে বাধ্য হয়। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বাল্টিক সাগরের যোগ রক্ষাকল্পে পোলিশ করিডরের ব্যবস্থা করা হল। এক আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে জার্মানির খনিজসমৃদ্ধ সার অঞ্চলটি তুলে দেওয়া হয়। এমনকি জার্মানির উপনিবেশগুলিও ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। এই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এইভাবে ইউরোপের পুনর্গঠনের ফলে ইউরোপের মানচিত্রের চেহারাই একেবারে বদলে গেল।

শুধু তাই নয়, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও জার্মানিকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হল। জার্মানির অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রিত করে দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তার উপর এক বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানির উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কয়েকটি দেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভার্সাই সন্ধি তার কোন সমাধান করতে পারেনি, বরং আরও নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, এই সময়ে ইটালী দেশে দুঃখ-কষ্ট ও অপমানের বোঝা বৃদ্ধি পায়। দেশের এই দুর্দিনে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে এমন একজন শক্তি-শালী নেতার নির্দেশ পালনের জন্য দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ঠিক এই সময়ে ইটালীতে আবির্ভূত হলেন বেনিটো মুসোলিনি। তিনি যুদ্ধফেরত সৈন্যদের নিয়ে 'ফ্যাসিস্ট' নামে একটি দল গঠন করলেন (১৯১৯ খ্রীঃ)।


মুসোলিনি

ফ্যাসিস্টদের আদর্শকে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের উপর ফ্যাসিবাদের কোন আস্থা

নেই। ফ্যাসিবাদ শান্তির আদর্শেও বিশ্বাসী নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য যুদ্ধই তাদের নিকট কাম্য। এই মতবাদে দলের নেতাই দেশের সর্বেসর্বা।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট দলের নেতা মুসোলিনি ইটালীর শাসনক্ষমতা অধিকার করেন। মুসোলিনির শাসনে ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা উন্নতি হয়। মুসোলিনি সমস্ত বিরোধী দলকে কঠোরভাবে দমন করেন। দেশের সমস্ত সম্পদ তিনি সৈন্যবাহিনী গঠনে ব্যয় করেন। এতে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থার অবনতি হয়। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসোলিনি অন্যায়ভাবে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইটালীতে একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

মুসোলিনি

নাৎসীবাদের উদ্ভব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীর মত জার্মানিতেও জনসাধারণের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানির আর্থিক দুরবস্থা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দেশবাসী একজন সুযোগ্য নেতার প্রতীক্ষায় ছিল এই সময়ে জার্মানিতে আবির্ভাব হয় অ্যাডল্‌ফ হিটলার নামে এক মহাশক্তিধর নেতার। তিনিও যুদ্ধফেরত জার্মান সৈন্যদের নিয়ে 'জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী দল' নামে একটি দল গঠন করেন। সংক্ষেপে এই দলকে বলা হত 'নাৎসী'।

নাৎসীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিকে বলা হয় নাৎসীবাদ। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে নাৎসীবাদের অনেক মিল ছিল। নাৎসীবাদও গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরোধী ছিল। নাৎসীরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। ফ্যাসিস্ট দলের মত নাৎসী দল উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক। দলনেতাই তাদের রাষ্ট্রনেতা।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির নাৎসী দলের নেতা হিটলার দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। ক্ষমতা অধিকার করে হিটলার জার্মানিকে পুনর্গঠিত করেন এবং অনেক জনহিতকর কাজও করেন। তিনি জার্মানিকে আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি করে তোলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই-এর সন্ধি নাকচ করে সমগ্র উইরোপে জার্মানির প্রভুত্ব স্থাপন। এই সময়ে

জাপানও সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার মুসোলিনি ও জাপানের সঙ্গে এক কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এইবার হিটলার দাবি করলেন জার্মানির বাইরে যেখানেই জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চল রয়েছে সেগুলি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে হবে। এই অজুহাতে হিটলার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি অংশ দখল করেন। ক্রমে তাঁর সাম্রাজ্য- লিপ্সা আরও বেড়ে গেল।



হিটলার

প্রেসিডেণ্ট হিটলার এতদিন ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার একাধারে হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট—এক কথায় সর্বেসর্বা। তাঁর নেতৃত্বে জার্মানিতে গণতন্ত্রের বিনাশ হল।

জাতিসংঘ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি সম্মেলনেই জাতিসংঘের উৎপত্তি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন জাতিসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠল। যুদ্ধের পরিবর্তে মানুষ যাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করতে পারে এটাই হল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-সমূহ এবং পরবর্তীকালে পরাজিত জাতিগুলিও জাতিসংঘের সদস্য হয়। জাপান, ইটালী ও জার্মানিও জাতিসংঘে যোগদান করে, কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা পদত্যাগ করে। আমেরিকা জাতিসংঘে যোগদান করেনি!

জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় জেনেভা শহরে। হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক বিরোধ উপস্থিত হলে হেগ বিচারালয় তার বিচার করত। তাছাড়া শিল্প ও শ্রমিক সংস্থাও স্থাপিত হয়।

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা : জাতিসংঘ গোড়ার দিকে কিছু কিছু রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘের নির্দেশে গ্রীস যুদ্ধ বন্ধ করে। তাছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, ভেজাল ঔষধ বিক্রয় বন্ধ, নারী জাতির কল্যাণসাধন প্রভৃতি ব্যাপারেও জাতিসংঘের সফলতা পরিলক্ষিত হয়।

জাতিসংঘের সফলতার এইরূপ দু'একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও বড় বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপরতার জন্য জাতিসংঘের হাতে তার সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার কোন শক্তি ছিল না। সেইজন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে জাতিসংঘ কিছুই করে উঠতে পারেনি। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। জাতিসংঘ এই আক্রমণও বন্ধ করতে পারেনি। ১৯৩৫ খ্রীঃ ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে। জাতিসংঘের পক্ষে এই আক্রমণও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘও উঠে যায়।

কালপঞ্জী

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন	১৯১৯ খ্রীঃ
ভার্সাই সন্ধি	১৯১৯ খ্রীঃ
জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা	১৯১০ খ্রীঃ
ইটালীতে মুসোলিনির ক্ষমতা লাভ	১৯৩৩ খ্রীঃ
জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতালাভ	১৯৩৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৯নম্বর**

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলন কেন এবং কিভাবে হয়েছিল? এই সম্মেলন কতটা সফল হয়েছিল?

২। ইউরোপের পুনর্গঠন কিভাবে হয়েছিল তা আলোচনা কর।

৩। ইটালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভ ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। জার্মানিতে কিভাবে হিটলারের অভ্যুদয় ঘটেছিল?

৫। জাতিসংঘ কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল? এই সংঘ কতটুকু সফলতা লাভ করে?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৩নম্বর**

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পিছনে কি যুক্তি ছিল?

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত প্রধান চারজন প্রতিনিধির নাম কি কি?

৩। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে কিভাবে অপদস্ত করা হয়?

৪। ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝ?

৫। নাৎসীবাদের মূল কথা কি?

৬। জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **১নম্বর**

১। **দু'এক কথায় উত্তরদাও:**

(ক) চৌদ্দ দফা দাবি কে প্রচার করেছিলেন?

(খ) প্যারিস শান্তি সম্মেলনে কে সভাপতি ছিলেন?

(গ) মুসোলিনির দলের নাম কি?

(ঘ) নাৎসী দল কে গঠন করেন?

(ঙ) জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল?

অধ্যায়

পনেরো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পঁচিশ বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধও বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত, কেননা এই যুদ্ধে বিশ্বের প্রায় সকল সভ্য জাতি জড়িত হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে আগেকার কোন যুদ্ধেরই তুলনা হয় না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হওয়ায় ফলে ইউরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির ওপর নানাপ্রকার শর্ত আরোপ করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে জার্মানির ওপর মিত্রশক্তিবর্গ প্রতিশোধ গ্রহণ করে অদূরদর্শিতার কাজ করেছিল। তাছাড়া জার্মানির শক্তি হ্রাস করে এবং তার নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত জাহাজ ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মার্ণের উপর নানাপ্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করে দেশের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করতে থাকে। বলা বাহুল্য জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তির এই বৈষম্যমূলক আরচণ জার্মানবাসিগণকে প্রতিশোধ পরায়ণ করে তুলেছিল। জার্মানবাসীদের এই প্রতিশোধগ্রহণের মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে

দ্বিতীয়তঃ, বলা যেতে পারে যে, ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিত্রতা সেই সময়ে ভার্সাই সন্ধি বলবৎ রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির অল্প দিনের মধ্যেই উভয় দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভিন্নমুখী হয়ে পড়লে, জার্মানির পক্ষে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি উপেক্ষা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালান সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ, বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর পর যে কয়েকটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহত

হয়েছিল সেইগুলি পুরোমাত্রায় বিফল হয়ে যায়। এই সম্মেলনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ শক্তিগুলির অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ করা। সম্মেলনগুলির বিফলতার ফলে প্রত্যেক শক্তিই ভার্সাই চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করে সামরিক শক্তি, নৌবাহিনী ও বিমানবন্দর বাড়াতে থাকে।

চতুর্থতঃ, লীগ অফ নেশনস্-এর বিফলতার ফলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। জাপান, জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশকে দমন করা লীগের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরন্তু জাপান ও জার্মানি লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করলে পৃথিবীতে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক হিটলার অষ্ট্রিয়া অধিকার করে সুদাতেনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের ওপর আক্রমণ চালালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিলেন।

এই যুদ্ধে জার্মানি, ইটালী ও জাপান ছিল একদিকে; আর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল অপরদিকে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়।

চার্চিল

রুজভেল্ট

ফলাফলঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জার্মানি ও ইটালী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এইভাবে জার্মানি, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতির কাছে পরাজিত হলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

যুদ্ধের ফলে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী হয়েছে। কত মানুষের যে প্রাণ, সম্পত্তি, বাড়ীঘর এবং শহর

ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আণবিক শক্তির প্রয়োগে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামে শহর দুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিরাট ধ্বংসলীলার পরে সারা পৃথিবীতে দেখা দেয় নিদারুণ অর্থ নৈতিক সংকট ও চরম খাদ্যাভাব।

যুদ্ধশেষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিজেতা দেশগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। ফলে পৃথিবীব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটেছে। যুদ্ধের পর পৃথিবী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নেতৃত্বে ইউরোপের পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয়েছে। এদের বলা হয় পশ্চিমী রাষ্ট্র-জোট। রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দেশগুলিকে বলা হয় পূর্বরাষ্ট্র জোট। তবে কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও রয়েছে।

যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে স্থির হয়, জগতে শান্তিরক্ষার জন্য প্রাক্তন জাতিসংঘের অনুরূপ একটি সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। তদনুসারে যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো নগরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা' করেন।

কালপঞ্জী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা	সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান	১৯৪৫ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ **৯নম্বর**

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ কর।

নির্দেশক প্রশ্ন ✽ ✽ ✽ ✽ **তিন নম্বর**

১। জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তিগুলির অবিচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কতখনি দায়ী ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে জাতিসংঘের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয় কেন ?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিরূপ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন - - - - - - - - - **এক নম্বর**

১। **এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) হিটলার কবে পোলাণ্ড আক্রমণ করেছিলেন ?

(খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন ?

(গ) চার্চিল কে ?

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শেষ হয় ?

(ঙ) হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি কোথায় অবস্থিত ছিল ?

অধ্যায়

ষোল

ভারতবর্ষ (১৯১৯—১৯৪৭ খ্রীঃ)
স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—পটভূমিকা ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল। এই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবর্গের মধ্যে আপসরফা হয় এবং চরমপন্থীরা পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করে জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। তাছাড়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মুসলীম লীগের সদস্যগণ জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুগ্মভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনের সামিল হতে স্বীকৃত হন। ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পায়।



মহাত্মা গান্ধী

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ইংলণ্ডকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করেছিলন, কারণ দেশবাসীর আশা ছিল যে, যুদ্ধাবসানে ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ইংরাজ শাসকবর্গ দেশবাসীর দাবি মেনে নেয়নি। অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দেশব্যাপী হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন। বেসান্ত ও তিলককে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে উপযুক্ত নেতার অভাবে আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতীয়দের আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরাজ সরকার মন্টেগু চেমসফোর্ড

সংস্কার চালু করেন। মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তন করায় ভারতবাসী ইংরাজদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন একথা বলা যায় না। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের কর্তৃত্ব পূর্বেকার ন্যায়ই বলবৎ ছিল। ফলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। ঐ আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন : ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। সেই সময়ে শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। শাসকবর্গের অত্যাচার ও বর্ণ-বৈষম্য গান্ধীজীকে ব্যথিত করেছিল। তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজীর এই আন্দোলনের উৎস ছিল সত্য ও অহিংসা।

মহাত্মা গান্ধী

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ সরকারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে ইংরাজগণ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। ভারতবাসীর ইংরাজ বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে ইংরাজ সরকার রাউলাট আইন জারি করে অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করে।

মহাত্মা গান্ধী এই আইন জারির বিরুদ্ধে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ দিল্লী, অমৃতসর মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ইংরেজ সিপাহীগণ সমবেত জনসভার উপর অবিশ্রান্তভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এই গুলিবর্ষণের ফলে প্রায় এক হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। এবং প্রায় দু-হাজারের বেশী মানুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। গান্ধীজী এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে সেই সময়ে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইংরাজ সরকারের প্রতি বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানগণ সেই সময় খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

এই খিলাফতেরই এক সভায় গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও গান্ধীজীর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট উপবাস, হরতাল ও জন-সেবার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের একদিকে ছিল খেতাব বর্জন ; সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকুরি ও আদালত বর্জন করা এবং মাদক দ্রব্য বর্জন করা; অন্যদিকে ভারতবাসীর মধ্যে চরকায় সুতো কাটার প্রবর্তন প্রভৃতি অভ্যাস করা এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনও অসহযোগের কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহ-যোগ কর্মসূচীতে বিপুল উন্মাদনার সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সরকারী চাকুরি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিল। কৃষক ও শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করেছিল। সরকারী দমননীতিও সেই সময়ে সমানভাবে চলতে থাকে। ইংরাজ সরকার অহিংস সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠি ও গুলিবর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ সরকার ত্রিশ হাজারেরও অধিক সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করেছিল। এই আন্দোলনকে ভারতের প্রথম গণ-আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলনে যে সব বিখ্যাত নেতা গান্ধীজীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয় (সৌকত ও মহম্মদ), চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়, প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয় (বিঠল ভাই ও বল্লভ ভাই), চক্রবর্তী রাজ গোপালাচারী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন তীব্রবেগে চলছে, সেই সময় চৌরিচৌরার ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে মর্মাহত করেছিল। বিহারের চৌরিচৌরা নামক স্থানে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ইংরাজ সিপাহীদের বর্বরোচিত কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে সত্যাগ্রহীরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এক ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায় এবং থানায় অগ্নিসংযোগ করে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক ও বীভৎস হিংসার নিদর্শন দেখে মহাত্মা গান্ধী অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় ভারতবাসীর মনে তখন হতাশা দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বরাজ্য দল গঠন করেন।

আইন-অমান্য আন্দোলন ঃ অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে মন্থরতার ভাব দেখা দিয়েছিল, সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় তা পুনরায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসন-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করে। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। স্বভাবতঃই ভারতবাসী সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবার সিদ্ধাত গ্রহণ করে। ইতি-মধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল নেহেরু একটি সংবিধানের খসড়া রচনা করেন এবং একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে তা পেশ করেন। এটি নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে



জহরলাল নেহেরু

মতিলাল নেহেরু ও অন্যান্য সদস্য ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্জনকে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রগতিশীল সদস্যগণ এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হননি। পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন কিছুই তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারল না। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আইন-অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতবাসী দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালন করেছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই সময়ে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম থেকে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের সর্বত্র আবাল বৃদ্ধ নরনারী এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করেছিল। বাংলার মেদিনীপুরে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন **বীরেন্দ্রনাথ শাসমল**। মীরাটে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মৌলানা **আবুল কালাম আজাদ**। এছাড়া মুঙ্গের, পাটনা, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানেও এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের খান আবদুল গফফর খানও আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। খান আবদুল গফফর খানকে সীমান্ত গান্ধী আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। গান্ধীজীর ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ অহিংস কর্মপন্থার দ্বারা দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

খান আবদুল গফফর খান

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে যুক্তপ্রদেশের কৃষকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁরা জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সরকারের খাজনা বন্ধ করে দেয়।

আইন-অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী স্তরঃ আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজী যে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি। বৃটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতাকে প্রশমিত করবার জন্য ভারতবাসীর উত্থাপিত দাবির কতকগুলি শর্ত মেনে নিয়েছিল। এই সময় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী জাতীয়

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকগুলির প্রতিশ্রুতি হিসাবে ইংরাজ সরকার ভারত-শাসন আইনের দ্বারা ভারত-বাসীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন অনুসারে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগের এক সভায় ঘোষণা করেন ভারতের হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। তিনি সেই সময় মুসলমানদের জন্য পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। স্বভাবতঃই এই সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। সেই সময় বিশ্ব পরিস্থিতিও এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। ইংরাজ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপস আলোচনার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পরে ইরাজ সরকার ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। এই প্রস্তাব জাতীয় সরকার অগ্রাহ্য করে। ক্রীপস্‌-এর প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবির কোন উল্লেখ ছিল না বলে মুসলিম লীগও এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তৃতীয় পর্যায়ের সত্যাগ্রহ আন্দোলন—'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়।



মহম্মদআলি জিন্নাহ্

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স

ভারত ছাড়ো আন্দোলন : ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ সরকারকে অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করবার দাবি জানান। ইংরাজ যদি অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করে, তাহলে তিনি অহিংস নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগ করবেন। ৮ই আগস্ট জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এই মর্মে

প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ৯ই আগস্ট ইংরাজ সরকার কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সকলকেই গ্রেফতার করে। সুতরাং গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থায় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালানো সম্ভব হয়নি। ভারতবাসী নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। গান্ধীজীর অবর্তমানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সর্বক্ষেত্রে অহিংস পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল তা বলা চলে না। কিন্তু 'আগস্ট বিপ্লব' নামে পরিচিত এই গণবিক্ষোভ এক তীব্র গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। ভয়াবহ দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও সাধারণ মানুষ বিপুল উৎসাহে সরকারের পুলিশ ফাঁড়ি, রেলস্টেশন ও ডাকঘরে আগুন লাগায়, রেল লাইন অপসারণ করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

নেতৃত্বহীন এই আন্দোলন সেকালের সাধারণ মানুষের তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং বৃটিশ বিদ্বেষকেই প্রমাণ করে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুরের সংগ্রামীদের দান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তারা সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল এবং তমলুকে স্বাধীন জাতীয় সরকারগঠন করেছিল। এই প্রসঙ্গে পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি তমলুক থানা আক্রমণের সময়ে জাতীয় পতাকা হাতে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে পুলিশের লাঠি ও গুলির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ইংরাজ সরকারের দমননীতির ফলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কিছুকালের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারারুদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনও একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে নিয়ে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজদের আক্রমণ করেছিলেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভারত

অভিযান ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করে বিদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি অতি কষ্টে আফগানিস্তানের পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে জার্মানিতে এসে পৌঁছায়। জার্মানিতে তিনি ফুয়েরার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জার্মানির সহযোগিতায় ইংরাজ শাসকগণকে দেশ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কারণ তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশীয়দের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত ইংরাজদের দেশ থেকে বিতাড়ন সম্ভবপর হবে না। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের কাছে স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। তিনি জার্মানির প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এই সময়ে রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র জাপানে গমন করেন।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

রাসবিহারী বসু ও মোহন সিং ইতিমধ্যে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় সৈন্যদল নিয়ে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী গঠন করেছিলেন। সিঙ্গাপুরেই 'আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী' গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া সেই সময়ে রাসবিহারী বসু 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' নামে অপর একটি সংস্থাও গঠন করেছিলেন। কিন্তু আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে এই বাহিনীর কার্যকলাপ ব্যাহত হচ্ছিল। এমন সময় রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী ও 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের' দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রনেই তিনি জাপানে উপস্থিত হয়েছিলেন। জাপানে উপস্থিত হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর

সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আগমনে এবং আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণে এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী ভারতীয়গণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নেতাজীর, 'দিল্লী চলো' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিল। প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সেনাগণ ইম্ফলে প্রবেশ করে এবং তা অধিকার করে নেয়। ১৯শে মার্চ ভারত সীমান্তের মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইম্ফলের পরে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ে ইংরাজ ও মিত্রশক্তির হাতে জাপান বিভিন্ন স্থানে পর্যুদস্ত হচ্ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জাপানের পক্ষে আর আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীকে সাহায্য দান করা সম্ভব হল না। তাছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব ও বৃষ্টিপাতের দরুন আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর সেনাগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। এই সময় প্রচার হয় যে, নেতাজী বিমানযোগে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেছেন। অবশ্য এর সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন।

প্রতিক্রিয়া: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ-হিন্দ্ সৈন্যের সাহায্যে ভারতকে ইংরাজ শাসনমুক্ত করতে পারেন নি বটে, কিন্তু ঐ সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ ভারতবাসীর মনে যেমন উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল, তেমনি শাসকবর্গের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। ইংরাজ সরকার আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর ঐ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিচারের উদ্দেশ্যে লালকেল্লায় যুদ্ধবন্দীদের বিচার আদালত গঠন করেছিল। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হলে সরকার তথাকথিত অপরাধীদের ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মুকুব করতে বাধ্য হয়েছিল।

নেতাজী আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সাহায্যে ভারতকে বিদেশী শাসন মুক্ত করবার প্রচেষ্টার পরে ভারতের নৌ-সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নৌ-সেনাগণ ইংরাজ সরকারের অত্যাচার ও পক্ষপাতমূলক নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ইংরাজ সরকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই নৌ-বিদ্রোহকে দমন করেছিল বটে, কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংলণ্ডে বৃটিশ সরকারের শাসনভার গ্রহণ করল শ্রমিকদল। তারা ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিমিশন প্রেরণ করে। এই মিশনের তিনজন সদস্য-স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, প্যাথিক লরেন্স ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার প্রত্যেকেই বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। মন্ত্রিমিশন জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কংগ্রেস পার্থীগণ বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিন্নাহ্-র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানায় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উস্কানি দিতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বলে ঘোষিত হয়। কলিকাতা, বিহার ও নোয়াখালিতে সাংঘাতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় এই দাঙ্গা বন্ধ হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্য সম্পাদনের জন্য বৃটিশ সরকার লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বহু চেষ্টা করেও জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ সদস্যদের একমত করতে পারেন নি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা

হয়—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং পূর্ববাংলা ও আসামের শ্রীহট্ট—এই অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত উপরিউক্ত ঘোষণাকে বৃটিগ প্রতিনিধি সভা অনুমোদন করে এবং সেই মর্মে ভারতের স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে। এইভাবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন। মিঃ জিন্নাহ্ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হন।



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

কালপঞ্জী

মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড শাসন সংস্কার	১৯১৯ খ্রীঃ
রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড	১৯১৯ খ্রীঃ
অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন	১৯২০ খ্রীঃ
সাইমন কমিশন	১৯২৮ খ্রীঃ
আইন-অমান্য আন্দোলন ও প্রথম গোল টেবিল বৈঠক	১৯৩০ খ্রীঃ
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক	১৯৩১ খ্রীঃ
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক	১৯৩২ খ্রীঃ
নতুন ভারত-শাসন আইন	১৯৩৫ খ্রীঃ

'ভারতছাড়' আন্দোলন	১৯৪২ খ্রীঃ
আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের 'দিল্লী চলো' অভিযান	১৯৪৪ খ্রীঃ
নৌ-বিদ্রোহ	১৯৪৬ খ্রীঃ
ভারতের স্বাধীনতা লাভ	১৯৪৭ খ্রীঃ

অনুশীলনী

সাধারণ প্রশ্ন ------------------ নয় নম্বর

১। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে শুরু হয় ?

২। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনের কাহিনী লেখ।

৩। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কিভাবে শুরু হয় ?

৪। কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * * * * * তিন নম্বর

১। অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচী কি ছিল ?

২। খিলাফৎ আন্দোলন কি ?

৩। আইন-অমান্য আন্দোলনে আবদুল গফ্ফর খানের ভূমিকা উল্লেখ কর।

৪। জনমনে আজাদ-হিন্দ ফৌজ কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ?

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, (খ) সাই-মন কমিশন, (গ) মাতঙ্গিনী হাজরা, (ঘ) রাসবিহারী বসু।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ------------------ এক নম্বর

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মন্টেগু-চেমস্ ফোর্ড সংস্কার কত খ্রীষ্টাব্দে চালু হয় ?

(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় ?

(গ) কাকে 'সীমান্ত গান্ধী' বলা হয় ?

(ঘ) 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কবে গৃহীত হয় ?

অধ্যায়

সতেরো

(ক) চীন ও দঃ পূঃ এশিয়ার বিপ্লব

(ক) চীনের বিপ্লব (১৯১১—১৯৪৯ খ্রীঃ)

ইউ য়ান-সিকাই ও সান-ইয়াৎ-সেনের অন্তর্কলহে প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইউ য়ান-সিকাইকে প্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতি করে সান-ইয়াৎ-সেন ঐ পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের উপর ইউ য়ান-সিকাই-এর কোন আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তিনি চীনে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে নিজের এবং বিদেশীদের স্বার্থের দিকেই বেশী মনোযোগী হলেন। এইসব ব্যাপার সান-ইয়াৎ-সেন মোটেই পছন্দ করলেন না। শীঘ্রই তাঁদের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হল। আর এই বিবাদের ফলেই চীন প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। ইউ য়ান-সিকাই বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করলেন। নিরুপায় হয়ে সান্-ইয়াৎ-সেন দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে বিপ্লবী গণতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এদিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান-সিকাই মারা যান।

তু-চুনদের কবলে চীন ঃ উত্তর চীনে তখন মাঞ্চু আমলের সমর নায়কেরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকে। তাদের বলা হত তু-চুন। দেশের এই পরিস্থিতির সুযোগে স্বার্থান্বেষী তু-চুনরা নানারকম সুযোগ-সুবিধা লুটে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিদেশীরা এদের অর্থ সাহায্য করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে লাগল। তু-চুনদের অত্যাচারে তখন চীনের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

সান্-ইয়াৎ-সেনের কুয়েমিন্ তাঙ্ দল ও তাঁর তিনটি মৌলিক নীতি ঃ সাধারণতন্ত্র রক্ষা কল্লে সান্-ইয়াৎ-সেন চীনে একটি নতুন দল গঠন করে-ছিলেন। এই দলের নাম কুয়োমিন্ তাঙ্ বা জাতীয়তাবাদী দল। দেশের

উন্নতির জন্য সান্-ইয়াৎ-সেন অনেক ভেবে চিন্তে কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের তিনটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করলেন। এই তিনটি নীতি হল — জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা। প্রথমতঃ, বিদেশীদের হাত থেকে দেশের সমস্ত কর্তৃত্ব চীনবাসীদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, চীনে কোন রাজতন্ত্র থাকবে না, দেশের শাসনভার থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। আর তৃতীয়তঃ, দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। সান্-ইয়াৎ-সেন তাঁর নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৯২৫ খ্রীঃ)।

৪ঠা মে-র আন্দোলন ঃ এদিকে জীবিকা ও ন্যায্য অধিকারের দাবিতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের গোড়ার দিকে সাংহাই শহরের কাপড়ের কলগুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এখানকার কাপড়ের কলগুলি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ধর্মঘটের সময় একজন শ্রমিক নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে ছাত্র ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীর নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিবর্ষণ হয়। তাতে বহু লোক হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে চীনবাসীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ল।

কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সম্পর্ক (১৯২১-১৯২৪খ্রী ঃ) এই সাংহাই শহরেই রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের প্রভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রথম কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়েছিল। ক্রমে কমিউনিস্টরা চীনের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিস্টরা কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিল। তার ফলে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীও তাদের সঙ্গে যোগদান করে। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন কমিউনিস্ট বিরোধী। তাঁর কুয়োমিন্ তাঙ্ দল কৃষকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে জমিদারদের স্বার্থকেই বড় করে দেখত। তথাপি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু কমিউনিস্ট কুয়োমিন্ তাঙ্ দলে যোগদান করেছিল। এই দলে থেকেই

তারা গোপনে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। শীঘ্রই দুই দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল।

চিয়াং কাইশেকের দমনমূলক নীতি : সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক জাতীয়তাবাদী দলের নেতা হন। তিনি বিদেশী শিল্পপতিদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা বিদেশী শিল্পপতিদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইল। তারা জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে সেগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চাইল। কমিউনিস্টদের এইসব তৎপরতা চিয়াং মোটেই বরদাস্ত করলেন না। তিনি কুয়োমিন্ তাঙ্ দল থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয়, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড দমননীতি অবলম্বন করলেন। তাঁর নির্দেশে কমিউনিস্টদের প্রতি উৎপীড়ন শুরু হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। চিয়াং-এর নির্যাতনে কমিউনিস্টরা দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল।



চিয়াং কাইশেক

কমিউনিস্টদের দীর্ঘ অভিযান : কমিউনিস্টদের এই সংকটকালে মহান নেতা মাও-সে-তুঙ তাদের পরিত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি হুনান অঞ্চলে একটি বিপ্লবী সৈন্যদল গঠন করেন। তারা গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। চিয়াং কাইশেকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে প্রায় এক লক্ষ কমিউনিস্ট সৈন্য নিয়ে চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান শুরু করেন। দীর্ঘ ৬০০০ মাইল হেঁটে অবশেষে তারা সেন্সিতে পৌছায় (১৯৩৪ খ্রীঃ)। এই ঘটনা 'লং মার্চ' নামে খ্যাত।

সিয়াং-কুর ঘটনা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটল। চিয়াং কাইশেকের এক সেনাপতির সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট চিয়াংকে সিয়ান বা সিয়াং-ফু নামক স্থানে এক গুপ্ত জায়গায় কিছুদিনের জন্য আটক করে রাখে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং চীনের গোলযোগের সুযোগে ক্রমে তারা

খাস চীনও আক্রমণ করে বসে। চিয়াং তখন কমিউনিস্টদের দমনে ব্যস্ত; জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধের দিকে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। কমিউনিস্টরা এই বিপদের সময় চিয়াং-এর দলের সঙ্গে মিলিতভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু চিয়াং তাদের আবেদনে কোন সাড়া দিলেন না। এই কারণেই কমিউনিস্টরা তাঁকে আটক করে রেখেছিল। পরে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে ঐক্য : এইবার জাতীয়তাবাদী দলের নেতা চিয়াং কাইশেক ও কমিউনিস্ট দলের নেতা মাও-সে-তুঙ্ এর মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হল। তারা সম্মিলিতভাবে বিদেশী শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : চীন জাপান যুদ্ধ চলাকালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায়। চীনকে রাশিয়া ও আমেরিক জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করলে চীন-জাপান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

গৃহযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে কমিউনিস্টদের প্রভাব দারুণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে দেশের বহুলোক কমিউনিস্ট দলে যোগদান করে। রাশিয়ার সহযোগিতায় এবং মাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল শক্তিশালী হয়ে উঠল। শীঘ্রই আবার কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং কাইশেকের জাতীয়তাবাদী দলের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এদিকে আমেরিকাও চিয়াংকে অস্ত্র দিয়ে সাহয্যে করতে লাগল। কিন্তু চিয়াং যুদ্ধে পরাজিত হতে লাগলেন। ফলে চীনের মূল ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের দখলে আসে।

দুই চীন : অবশেষে চিয়াং কাইশেক চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে চীনের বৃহৎ দ্বীপ ফরমোজা (তাইওয়ান) অধিকার করে সেখানে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাজ্য পত্তন করেন। মাও-সে-তুঙ চীনের মূল ভূখণ্ডে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেন। মাও-সে-তুঙ হলেন গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রপতি।

(খ) ১৯৪৫ সালের পর দক্ষিপূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব--ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া :

ইন্দোচীন :—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসীদের অধিকৃত ইন্দোচীনেও সাম্যবাদীরা প্রবল হয়ে ওঠে। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ইন্দোচীনের

জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎমিনদল উত্তর ইন্দোচীনে স্বাধীনতা লাভ করে। দক্ষিণ ইন্দেচীনেও ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এখানে ভিয়েৎনাম দলের নেতারা দেশ শাসন করেন। এঁরা সাম্যবাদের বিরোধী। এদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের বিরোধ উপস্থিত হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েৎনাম দলের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আমেরিকার প্রভাব বিলুপ্ত করবার জন্য এখানে দীর্ঘকাল ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়েছে।

ব্রহ্মদেশ : ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জাপানকে প্রতিরোধের জন্য তখনকার জননেতা আউং সানের নেতৃত্বে 'আন্টি ফ্যাসিস্ট লীগ' গঠিত হয়। জাপানকে বাধা দিতে গিয়ে ব্রহ্মবাসীরা যে শক্তি অর্জন করে, যুদ্ধের শেষে ইংরাজকে তা মেনে নিতে হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে স্বীকার করে।

মালয়েশিয়া : শ্যাম দেশের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপ এবং তার দক্ষিণ প্রান্তে প্রসিদ্ধ সিঙ্গাপুর বন্দরটি অবস্থিত। আগে মালয়ের দুটি ইংরাজ উপনিবেশ এবং নয়টি ইংরাজ আশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ছিল। ভারতের দৃষ্টান্তে সেখানেও স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেয় এবং ইংরাজরা মালয় যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দেয়। মালয়ে সুলতান উপাধিধারী রাজারা তাঁদের একজনকে রাষ্ট্র প্রধানরূপে নির্বাচন করেছেন। সম্প্রতি মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বোর্ণিও দ্বীপের ইংরাজ অধিকৃত সরাবক নামক রাজ্যটি এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নাম মালয়েশিয়া। আরও পরে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে বেরিয়ে যায়।

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য বলে পরিগণিত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া জাপানের অধিকারে আসে। যুদ্ধশেষে জাপান ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করলে সেখানকার অধিবাসীদের হাতে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র আসে। ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে গেলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের সঙ্গে ওলন্দাজগণের যুদ্ধ বাধে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে স্বীকার করে। ইন্দোনেশিয়া একটি উন্নতশীল প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র।

(গ) **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তেষের প্রসার :** এক সময়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ঘটে।

বর্তমানে এখানকার রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং অবশিষ্ট কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কঙ্গো সাধারণতন্ত্র. মালাগাসি, গ্যাবন, মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র, চাদ সাধারণতন্ত্র, নাইজার সাধারণতন্ত্র, ড্যাহোম, আইভরি কোস্ট সাধারণতন্ত্র, ভোলটেইক সাধারণতন্ত্র, মাউরিটেনিয়া, মালি যুক্তরাষ্ট্র ক্যামেরুণ, টোগো প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল তখন মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশও ইউরোপীয় প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য আন্দোলন করছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইউরোপীয় শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়েছিল।

আটলান্টিক সনদ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে এক যুদ্ধ-জাহাজে মিলিত হন। বিশ্বে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণা পত্র 'আটলান্টিক সনদ' নামে পরিচিত। এই সনদে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারকরা হবে; সকল জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে স্বীকার করতে হবে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা-এর উদ্দেশ্য :—এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংস্থার উপর। ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। এর উদ্দেশ্য অনেকটা জাতিসংঘেরই মত। তবে জাতিসংঘের চাইতে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষমতা অনেক বেশী। পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলি এবং আমাদের ভারতবর্ষ এই সংস্থার সদস্য।

সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার সঙ্গে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) প্রভৃতি কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান জড়িত থেকে আজ বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতির পরিকল্পনায় নিজেদের নিয়োগ করেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত সহযোগিতায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সৌহার্দ্যের ফলে বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার ঃ ধনী ও দরিদ্রের অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দূর করার উপরই সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য নির্ভর করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর বহু দেশেই সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে পাশাপাশি উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনও অনেক দেশে বিস্তারলাভ করেছে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া বহু দেশকে সাহায্য করেছে।

কালপঞ্জী

আটলান্টিক সনদ	১৯৪১ খ্রীঃ
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা	১৯৪৫ খ্রীঃ
ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা	১৯৪৮ খ্রীঃ
চীন সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	১৯৪৯ খ্রীঃ
ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা	১৯৪৯ খ্রীঃ
মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা	১৯৬৩ খ্রীঃ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন **৯ নম্বর**

১। চীন বিপ্লবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

নির্দেশক প্রশ্ন **৩ নম্বর**

১। কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের তিনটি মূলনীতি কি কি?

২। ৪ঠা মের আন্দোলন সম্পর্কে কি জান?

৩। কমিউনিস্টদের প্রতি চিয়াং কাইশেকের দমন নীতি আলোচনা কর।

৪। কিভাবে দুই চীনের স্বষ্টি হল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন **১ নম্বর**

১। দু'এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) তু-চুন কাদের বলা হত? (খ) কবে গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

———